পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে

ভারতীয় লোকযান গ্রন্থমালা
৩৩ বি, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

Paschimbanger Lokosanskriti O Sahitya Prasanga

সংস্করণ : ১৩৪৯

প্রকাশক : শ্রী গোপীনাথ সেন
৩৩-বি, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রণ : গীতা প্রিন্টার্স
২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান : পুস্তক বিপণী
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

লেখক সমবায় সমিতি গ্রন্থ বিপণী
ই-৯২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭০০০০৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

সূচীপত্র

বাংলার লোকসাহিত্যের ইতিহাস	১
পশ্চিমবাংলার লোকসংগীত	১৩
বৈষ্ণব সাহিত্যে গ্রাম্য কবিদের দান	২১
প্রাচীন কবির গান	২৮
কীর্তন	৩৫
গাজন	৪১
বাউল গান	৪৬
বাউল ও সুফী প্রভাবিত বাংলার লোকসংগীত	৫২
বাংলা লোকসংগীতে মালসী গান	৫৬
বাংলা লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য	৬৩
বাংলার বর্ষায় গ্রাম্য ছড়া ও হেঁয়ালী	৭১
পৌষ পার্বণ এবং নবান্নের গান	৭৪
বাংলার লোকসাহিত্যের অনুসন্ধান ও রক্ষণ ব্যবস্থা	৭৭
লোকসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ	৮৩
বাংলার লোকসংস্কৃতি	৮৯
বাংলার বৈষ্ণব সাধকগণ	৯৭
প্রাচীন বাংলা বৌদ্ধসাহিত্য	১০০
বাংলার লোকনৃত্য	১০৮
বাংলার লোকসংগীতে ভাদু ও টুসু গান	১১৩
বাংলার লোকসাহিত্যে ছড়ার ইতিবৃত্ত	১২৩
বাংলার লোকসাহিত্যের পথিকৃৎ দীনেশ চন্দ্র সেন	১৩৮
পশ্চিমবাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পদ পট ও পটুয়া সংগীত	১৪৪
বাংলা লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ	১৫৪
পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা	১৬০

বাংলার লোকসাহিত্যের ইতিহাস

লোকসাহিত্য চিরকাল মুখে মুখে চলে আসছে এবং যার পুরোমাত্রায় সংকলন হয়নি তার কিরকম ইতিহাস হবে? ইতিহাস যাকে বলি তার দিনক্ষণ সময় তারিখ আর প্রামাণ্য বিষয়বস্তু থাকা চাই। কিন্তু লোকসাহিত্যের সেরকম কোন প্রমাণ করবার মত দলিলপত্র নেই। তবে কি এ ইতিহাসের আদালতে হেরে যাবে? আমি যে এর বড় উকিল তা' নই। আমার আগে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ তাঁদের রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বাংলার লোকসাহিত্যে খণ্ডিত ইতিহাস রচনা করেছেন। লোকসাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করা বড় সহজসাধ্য নয়। এর মালমশলা পল্লীগ্রামের নিরক্ষর পল্লীবাসীর অন্তরে যে গুপ্ত ইতিহাসের ভাণ্ডার আছে তা থেকে কেউ লিখে রাখে না। এই গ্রাম্য জনগণের কাছ থেকে চন্দ্রকান্ত দে সংগ্রহ করে দীনেশচন্দ্রকে 'ময়মন সিং-গীতিকা' সংকলন করবার সাহায্য করেন এবং পরে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক রূপকথা, রসকথা ও গীতকথা সংগ্রহ করেন। দক্ষিণারঞ্জনের পুস্তকের বিশদ আলোচনা করে দীনেশবাবু 'Folk Literature of Bengal' গ্রন্থটি সম্পাদন করেন। আমি এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লোকসাহিত্যের কিঞ্চিত ইতিহাসের ইংগিত দেব।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য এই লোক-সাহিত্যের কাছে ঋণী। প্রাচীনকালে অর্ধশিক্ষিত সমাজ উচ্চ সংস্কৃত না বুঝতে পেরে সস্তা দামে কয়েকটি কাব্য, ছড়া, রূপকথা প্রভৃতি ছাপিয়ে নিজেদের বিদ্যার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলা দেশে সংস্কৃত-শিক্ষিত অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত শহরবাসী এবং অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত গ্রামবাসী এ দুজনের ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার ও ভাবধারায় বিশেষ তফাৎ না হলেও প্রথমের বিরাট ইতিহাস এবং শেষের অবলুপ্ত ইতিহাস। তাদের সাহিত্য দিনের পর দিন শব্দ, ভাব, ভাষা এবং রচনা সৃষ্টি হয়ে আপনা আপনি জন্মগ্রহণ করে স্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হয় কিংবা শিল্পী শিল্পে জীবিত থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আশ্রয় নেয়। তারপরে তা উই, ইঁদুর কিংবা প্রকৃতির

অত্যাচারে সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হলেও ধ্বংসমুখ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের সাহিত্যের তিনটি ধারা দেখা যায়—প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং বর্তমান যুগ।

প্রাচীন যুগ

বাংলার সম্ভ্রান্ত সাহিত্য যে বহু প্রাচীন তার পরিমাণ নির্ধারণ করে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। এটি প্রথম লোকসাহিত্য-প্রাপ্ত ইতিহাস। একাদশ শতাব্দীতে সরহ রচিত পুঁথি থেকে সাক্য ভিক্ষু প্রথম গুপ্ত নকল করেছিলেন। চর্যাগীতি-গুলি যে কোন উচ্চশ্রেণী পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত হয়েছিল তা মনে হয় না। এই সরল শাস্ত্র জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। এর একটি প্রমাণ থেকে বুঝা যায়—

পণ্ডিতলোঅ থমহু মহু
এত্থুন কিঅই কিঅপ্পু
জো গুরুবঅনে মই সুঅউ
তহি কিং কহমি সুগোপ্পু।

অর্থাৎ পণ্ডিতলোক আমাকে ক্ষমা কর; এখানে বিকল্প করা হচ্ছে না; যা আমি গুরুবাক্যে শুনেছি সুগোপন তা আমি বলি কি করে।

প্রাচীন লোকসঙ্গীতের নিদর্শন চর্যাগীতির মধ্যে বাংলা রূপ ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে খণ্ড খণ্ড বাঙালী জীবনের ইতিহাস জানা যায়। চর্যাগীতির মধ্য দিয়ে সেকালের সাধারণ ও দরিদ্র জীবনের যে খণ্ড চিত্র উঁকি দেয় তা কোথাও পাওয়া যায় না। তখনও দরিদ্র বাঙ্গালীর 'হাঁড়িতে ভাত নাহি' অথচ অতিথির কামাই নেই। বিবাহে যৌতুকের প্রাধান্য কিছু কম ছিল না বরং বরও বিয়ে করতে যেত বাজনা বাদ্য করে। আমাদের এই পুরান ইতিহাসে দৈনন্দিন জীবনের যে লিপি পাই তা কোন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বিষয়বস্তু থেকে দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন লোকসাহিত্যের সঙ্গে খনার বচনকে বাদ দেওয়া যায় না। এতে জ্যোতিষতত্ত্ব এবং নানা গৃহস্থালীর উপদেশ বর্ণিত আছে।

মধ্যযুগ

চর্যাগীতিগুলি কেবল দৈনন্দিন জীবনের চিত্র প্রতিফলিত করেনি, এর মধ্যে বহু দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পাই। যা ক্রমশঃ কালের আবর্তনে বৈষ্ণব পদাবলী, দরবেশ প্রভৃতি মিষ্টিক বা মরমী কবিদের কাব্যে স্থান পেয়েছে।

বাংলার নানা পূজা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল। যেমন, গাছ, সাপ এবং পল্লীগ্রামে খেতখামারে বহু অপৌরাণিক দেবদেবীর পূজা চলত। এই সকল গ্রামীন দেবদেবীকে অবলম্বন করে মন্ত্র, তন্ত্র, গান, গাথা ও কথা রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ধর্মঠাকুরের গাজন গান, মনসার ভাসান গান এবং এরকম বহু গান চলে আসছে। এ সকল গানগুলি উচ্চশ্রেণীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করল। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্যের যুগ আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে পাঁচালী কাব্য এক সময় জাতীয় সাহিত্য হিসাবে বিশেষ অংশগ্রহণ করেছিল। পাঁচালীগান অশিক্ষিত যে কোন লোকেরই কাছে দ্রুত প্রিয় হয়েছিল তার কারণ তাদের মস্তিষ্কে যেন সাংসারিক ঘটনাপঞ্জীর মত জড়িয়ে থাকত। কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী' ১২৪০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালীর কাছে খুবই প্রিয় হয়ে আছে। কৃত্তিবাসের কাব্য ছাপা হয় প্রথম শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে। ছাপা ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় আর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। এজন্য পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত কাব্যটির প্রত্যেক খণ্ডের ইংরেজী নামপত্রে তারিখ আছে ১৮০২ আর বাংলা নামপত্রে ১৮০৩। কৃত্তিবাসের পাঁচালী থেকে ঋণ করে কতশত বাংলার কবি পাঁচালী-কাব্য রচনা করেছিলেন তার শেষ নেই।

লোকসাহিত্য কেবল যে মৌখিক প্রচারিত হত তা নয়, এটি কোন কোন অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। ১৬৯৩ শকে দীনবন্ধু দাস 'সংকীর্তনামৃত' সংকলন করেন। ১৩০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসু 'কৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দ বিজয়' গ্রন্থ রচনা করেন। এর উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে দেখতে পাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রধানত ভাগবতেরই গল্পাংশের অনুসরণ করা হয়েছে। স্থানে স্থানে বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের অনুসরণও দেখা যায়। বর্ণনাময় বলে কাব্যে পয়ার ছন্দের আধিক্য, অল্প কয়েক জায়গায় শুধু দীর্ঘ ত্রিপদী দেখা যায়। পাঁচালী কাব্য বলে সর্বত্র রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে। পাঁচালীগান যখন চন্ডীমন্ডপের গায়কের সুমধুর কণ্ঠে শোনা যায় তখন সত্যই বাঙালীর রসসৃষ্টি করবার যে নিপুণতা আছে তা প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ সংগীতের মহাপ্লাবনে ডুবে গিয়েছিল। বাঙালী তখন নিজের পরিচয় পেয়ে 'আত্মবিস্মৃত নাম' ঘুচিয়ে প্রেম-জাহ্নবীতে ঝাঁপ দিল। সে সময় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কৃষ্ণকীর্তনে মেতে থাকত। সকলের মুখে 'লহ কৃষ্ণ নাম, বল কৃষ্ণ নাম, গাহ কৃষ্ণ নামরে'। সকলেই সমস্বরে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে কৃষ্ণনাম ভজিত। মহাপ্রভু 'কৃষ্ণনাম'কেই মোক্ষ বলেছেন।

তিনি 'কৃষ্ণনাম কীর্তনকে' এমন সরল, সহজ এবং গতিময় করলেন-যে সকল অজ্ঞ পল্লীগ্রামবাসী সেই গানে সর্বদাই বিভোর হয়ে থাকত। তিনি নিজে 'কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা' অভিনয় করে সকলের চোখ পরিতৃপ্ত করতেন। এ থেকে তৎকালীন ভক্তবৃন্দ উপকরণ সংগ্রহ করে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী যাত্রা গান রচনা করতেন। বাংলায় 'কৃষ্ণ কীর্তনের' প্রায় চল্লিশ জন রচয়িতার নাম পাওয়া গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই লেখকদের প্রতি তেমন আর কারও দৃষ্টি নেই। বহু কষ্টে সংগৃহীত পুঁথি থেকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এর প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে তেমন কোন ফল লাভ হয়নি। সেজন্য পুনরায় ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "তিরিশ বছর হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আজও শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক, যাঁরা সাধারণ সাহিত্যরসিক, যাঁরা বৈষ্ণবপদাবলীভক্ত তাঁদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। কাব্য মোদী পদাবলীভক্ত বাঙ্গালীর পক্ষে এ প্রশংসার কথা নয়। তবে এই অবহেলার কিছু হেতুও আছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বানান প্রচলিত পদ্ধতির নয়, ভাষাও প্রাচীন এবং দুর্বোধ্য। তবে আনুনাসিকের সঙ্গীণ খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্যকুঞ্জে একবার প্রবেশ করবেন, তিনি ঠকবেন না নিশ্চই।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ বেশিরভাগ পয়ার, আর এই পয়ারের ধ্বনিপ্রবাহ কাটা কাটা, ভাষাও তেমনি সংহত, মিত ও উজ্জ্বল। এই 'বাগবেণী' বা 'বাককেলী' কাব্যটি যখন নাট্যগীতে রসায়িত হত তখন শ্রোতাদের মেতে উঠতে বিলম্ব হত না। তা সহজেই অনুমান করতে পারি।

আর এক কথা, আধুনিক রুচির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা দোষ আছে। তবে এর জন্য কবি ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী তখনকার শিল্পাদর্শ ও সাহিত্যরুচি। আর গ্রাম্যতা অল্পস্বল্প নেই কোথায়? কালিদাসের কাব্যে আছে, জয়দেবের গানে আছে। মহাপ্রভুর সময় থেকে শ্রবণ কীর্তন বৈষ্ণব-মণ্ডলীকে নতুন পথ দেখিয়েছিল। তাঁর তিরোভাবের পর ভক্তেরা তাঁর নামে পদ রচনা করে দিনরাত নামকীর্তন করত। কৃষ্ণকীর্তনের মাধুরী নানা কারণে বিভক্ত হয়ে ভক্তের প্রাণে নব নব রসের ধারা এনেছিল, কৃষ্ণ ও রাধা এবং চৈতন্যকে অবলম্বন করে বাংলায় পালাকীর্তন, প্রেমকীর্তন, যাত্রা প্রভৃতি লোকগীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল। কীর্তনীয়াগণ কীর্তন গাইবার আগে গুরু বন্দনা করে থাকেন। তাঁদের স্তুতিতে পাই 'ও গৌরাঙ্গ হে, আমি অতি ভজনহীন,

সাধনহীন, কুকর্মান্বিত, সুধা মকরন্দ কখন তোমার পাদপদ্মে প্রদান করি নাই, গৌরাঙ্গ হে!" তাঁরা কলিযুগে গৌরাঙ্গকেই কৃষ্ণ বলেছেন। সেজন্য তাঁকে আরাধনা মানে কৃষ্ণকেই ভজা বলে মনে করতেন।

সংসার বিরাগী এবং সর্বহারা সমাজচ্যুত নারীরা সবসময় নিজেদের কৃষ্ণধামে গানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতেন। বাংলার বৈরাগী ও বৈষ্ণবীগণ সুন্দর সুন্দর কীর্তন রচনা করে খঞ্জনী ও একতারার সাহায্যে যে গান গেয়ে যেতেন তা সত্যই হৃদয়গ্রাহী এবং ভাবে অতুলনীয়। প্রেমসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ মধুসূদন কিন্নরের কীর্তন থেকে একটি গান উদ্ধৃত করলাম—

দীনে একবার হরি বল, হরি ভবের কান্ডারী
হরি বলে পারে চল।
বীণায় বল হরিধ্বনি শমন পালাবে আপনি
কাল নিবারণ চিন্তামণি
প্রহ্লাদ হরি ব'লেছিল ॥
শুনেছি পুরাণে বলে হরিনামের গুণে মোক্ষ ফলে
অজামিল তরিল হেলে
নারায়ণ বলেছিল।
বলে কি করিলাম, মিছে মায়ায় বন্দী হলাম,
(এখন) গুরুপদ না ভজিলাম
আসা যাওয়া সার হল ॥

তিনি পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগর কীর্তন গান করতে করতে মরজগৎ থেকে অন্তর্হিত হন।

বাংলার গীতিকবিতা জাতি-ধর্ম; উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে যে রস সৃজন করেছিল তা পাই বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে। গীতিকাব্য যদিও ধর্ম সাহিত্যের অঙ্গীভূত তথাপি এর প্রাণ মানুষের সমাজ, আদর্শ এবং নিত্যজীবনের ধারা রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে বৈষ্ণব গীতিকাব্যে সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। বাংলায় যত রকমের ধর্মের বা অধ্যাত্ম গান রচিত হয়েছিল এর মূলে বৈষ্ণবদের অবদান যে শ্রেষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর ভেতর দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং প্রেম রস আছে। নৃত্য ও গীত এই দুটির সমন্বয়ে এক অভিনব ভাবের সন্নিবেশও ঘটিয়েছে। এই গীত কবিতা থেকে বাউল, সুফী প্রভৃতি লৌকিক উচ্চ চিন্তাভাব সম্পন্ন কবিদের আরম্ভ হয়েছিল সপ্তদশ শতকে তারপর থেকে বহু সাধক কবি গানের দ্বারা আধ্যাত্মিক গান রচনা

করেছিলেন। কীর্তনের সুরে বহু গান রচিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে জাগ গান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে রচিত। মৈমনসিংহে ঘাটুগান অর্থাৎ কৃষ্ণরাধার যমুনার ঘাটে প্রেম মিলনের গান, বীরভূমে ভাদোর গান এবং নানা গ্রাম্য দেবদেবী বিষয়ক গীত প্রচলিত ছিল। এর নমুনা আজও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বাংলার গীতিকবিতাগুলি নানান সুরে নানান ভাষায় বিভক্ত হয়ে গ্রাম্য জনগণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

নানা লোক সঙ্গীত সেবীদের মধ্যে উচ্চভাব জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাউল গায়কগণ মনুষ্যলোকের সঙ্গে অদৃশ্যলোকের তন্ত্রীতে বেঁধে দিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাউল প্রভাব প্রবল হয়েছিল। বাংলাদেশে বহু মরমীয়া বাউল সাধকগণের নাম পাওয়া যায়। বাউলদের মধ্যে লালন ফকীর, সেখ মদন, পাগলা কানাই, দীন বাউল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের গান এতই মর্মস্পর্শী যে একবার শুনলে অন্তরে প্রবেশ করা যায়। বাউল ব্যতীত ভাটিয়ালী, বারমাষী প্রভৃতি গীত লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রকে উজ্বল করে রেখেছে।

গাথা জাতীয় গান পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত দামিনী চরিত্র গাথা (লিপিকাল ১২০৩ সাল) এবং ঐতিহাসিক গাথাগুলি আমাদের দেশের সাহিত্য সম্পদ। এ যেন ইংরাজী বা রাজস্থানী গাথার মত রাজবংশের কোন খ্যাতি প্রচার করে না। এর ভেতর সামাজিক, রাজনৈতিক, পৌরাণিক এবং জাতীয় নৈতিক ও মানসিক চরিত্রের নানাদিক পর্যালোচনা করেছে। ঐতিহাসিক গাথাগুলি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রাচীন ঐতিহাসিক গাথাগুলির মধ্যে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ', 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', কবি অনুপচন্দ্রের 'প্রতাপচন্দ্র লীলা-রস সংগীত', ত্রিপুরা রাজবংশ কাহিনী বর্ণিত রাজমালা এবং মুসলমান শাসন-কর্তাদের ইতিহাস জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। লৌকিক গাথা-রচয়িতাগণ এই সকল ইতিহাস রচনা করবার সময় প্রমাণ খুঁজেন না। তাঁরা জনশ্রুতি এবং নিজ ঘটনাবলী থেকে ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ করে নিজেদের কাব্যপ্রতিভার দ্বারা গাথা রচনা করেছিলেন। কোন কোন গাথা রচয়িতা জমিদার এবং শাসকবর্গের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। সেজন্য অনেক কবিকে রাজ দরবারে শাস্তি পেতে হয়েছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রাম নিবাসী রামপ্রসাদ মৈত্রের লেখা দুটিতে ঐতিহাসিক ছড়ায় ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বিচার ব্যবস্থার সরস ব্যঙ্গচিত্র পাওয়া যায়। এই সকল ঐতিহাসিক গাথাগুলি লোকের মুখে মুখে দিন ক্ষণ সময় তারিখ প্রভৃতি ইতিহাসের বর্ণনা

প্রসঙ্গ যেন কাব্যের মত মুখস্থ ছিল। তাঁরা দেশের খুঁটিনাটি খবর বহন করে সংবাদপত্রের কাজ করতেন।

মানিকচন্দ্র রাজার গানে তৎকালীন বাংলার রাজার শাসন প্রণালী বর্ণিত হয়েছে—

মাণিকচন্দ্র রাজা বঙ্গে বড় সতি
হাল-থানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি।
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায় ॥
অষ্টমি পূজার দিনে পাঁঠা গোটে লয় ॥
খড়ো বেচা হৈয়ে যে ঘড়ী ভরে যোগায়।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায় ॥
এত মানিকচন্দ্র রাজা সরয়া নালের বেড়া।
একতন যেকতণ বৈ রে যে খাইছে তার ছয়ারত ঘোড়া।
বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া ॥
কারো মাড়াল কেহ না যায়।
কারো পুষ্কণীর জল কেহ না খায় ॥
ভাটি হইতে বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত কৈল কড়ো ॥
আছিল দেড় বুড়ি খাজনা লৈল পোনার গন্ডা।
লাঙ্গল বেচায় যোঙ্গাল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপতে বেচায় দুধের ছায়োয়াল ॥

মানিকচন্দ্র রাজার রাজত্বে কোন প্রজার দুঃখ কষ্ট ছিল না। প্রজারা সাড়ে সাত গন্ডা কড়ি খাজনা দিত, কাঠওয়ালা খাজনার বদলে রাজাকে জ্বালানি কাঠ এবং পানওয়ালা পান দিত। যখন থেকে তিনি রায়তদের হাতে শাসনভার দিলেন তখন থেকে প্রজাদের দুঃখ কষ্টের সীমা রইল না। কবিতাটির শেষ অংশে তাহা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই স্থানটিতে বলা হয়েছে দক্ষিণ থেকে একজন লম্বা দাড়িওয়ালা বাঙ্গাল এল। সে এসে প্রজাদের খাজনা সাড়ে সাত গন্ডা থেকে পনের গন্ডা বাড়িয়ে দিয়ে এরকম দুর্দশাগ্রস্ত করেছিল যার জন্য তাদের লাঙ্গল, বলদ এমনকি প্রিয়তম দুধের শিশুকে বিক্রি করতে হয়েছিল। এই বাংলায় মর্মন্তুদ ঘটনা তা প্রাচীন সাহিত্য থেকে বর্তমান সাহিত্যে বাদ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জমিদারের নিষ্ঠুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। যার জন্য সারা বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল।

বর্তমান যুগ

অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরানো পল্লীগানগুলিতে নতুন রঙ ধরল। প্রথমে কীর্তন থেকে ধরা যাক। গড়ানহাটী ও রাণিহাটী এই দুটিতে কীর্তন ভাগ হয়ে বাংলার জনপদে নতুন আদর্শ প্রচার করল। এই গানের মধ্যে আকুলতাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে শ্রোতৃমন্ডলের আঁখিযুগলকে সর্বদাই সিক্ত করে রাখত। কৃষ্ণযাত্রা, নদের নিমাই এবং নিতাই গৌরের চরিত্রগুলি অভিনয়ে এখনও জীবন্ত হয়ে আছে। এ যুগে তর্যা, জারি, দেবীবিষয়ক মালসী, কবিগান এবং আখড়াই গান আরম্ভ হয়। কলকাতার সুবিখ্যাত আখড়াই-এর নায়ক নিধুবাবু ১২১২ অথবা ১২১৩ বঙ্গাব্দে দুটি সখের আখড়াই দল সৃষ্টি করেন। এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারের সমুদায় ভদ্রসন্তান এবং আর এক দল মনসাতলা অথবা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী নীলমণি মল্লিক ও তাঁর বন্ধুবর্গ আখড়াইদলে ব্রতী হন। এই উভয় দলে 'বাদী' হলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ থেকে গীত ও সুর প্রদান করতেন এবং মল্লিকবাবুর পক্ষ থেকে শ্রীদাম দাস আর কুলুই চন্দ্র সেনের পুত্র গকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গীত ও সুর তৈরী করতেন। শ্রীদাম দাস, ভবানী বিজয় এবং গোকুল চন্দ্র সেন খেউর গান রচনা করেন। এই সংগীত সংগ্র শ্রবণ ও দর্শন করতে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এরকম সখের আখড়াই স্থাপিত হলে ব্যবসায়ী আখড়াই-এর দল একেবারে উঠে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় আফ আখড়াই এর পর কবির লড়াই বা কবির গান শুরু হয়। দুই জোড়া ঢোল ও কাঁসির গগনভেদী শব্দে কবির তর্যা আরম্ভ হয়েছিল। এর উপাদান ধর্মমূলক, বিশেষতঃ ভবানী বিষয়ক, আগমনী, সখী সংবাদ প্রভৃতি গানে দুদলের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলত। যে দল জয়লাভ করত তারা ঢোলের কর্ণভেদী শব্দে মাতিয়ে দিত। এরকম প্রথম কবিওয়ালাদের দলের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন হরু ঠাকুর। তিনি রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সাহায্যে এবং উদ্যোগে পেশাদারী দল তৈরী করেন। হরু ঠাকুরের পর রাম বসুর উল্লেখ করতে পারা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কবিগান 'তরজার লড়াই'এ পরিণত হয়েছিল। এই শতাব্দী শেষ হবার আগে এর ধারা শুখিয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কবিগানের সেরকম উদ্দীপনা আর দেখা যায় না। কবিয়ালগণ পিতৃপুরুষের ব্যবসাকে কোন রকমে টিঁকিয়ে রেখেছিলেন। বিশেষতঃ তাঁরা বটতলার ছাপা বই থেকে কণ্ঠস্থ করে গেয়ে যেতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিয়াল ছিলেন দাশরথি রায় (জন্ম ১৮০৩ এবং মৃত্যু ১৮৫৭)। তিনি যেমন ধর্মবিষয়ক তেমনি

সংস্কারের কবিগান করে বাংলার জনগণকে তন্ময় করে তুলেছিলেন। তাঁর সকল গানগুলি পাঁচালিতে লেখা। তিনি সরল ভাষায় সকলকে সমাজ সংস্কার করবার উপদেশ দেন। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আন্দোলন করছিলেন তিনিও তাঁর মতকে সমর্থনকরে বহু কবিতা রচনা করেন।

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।
রাজ আজ্ঞায় দূতে আসি কাটে মুণ্ডু দিয়ে অসি
তা বলে দূতে কখন দূষী হয় না সেই পাপে।
কি আর ভাব সকলেতে হবে যেতে জেতে হতে
জেতের অভিমান সাগরে দাও স'পে।
বক ধর্ম্ম প্রায় আগত ভারত আদি পুরাণ মত
ভারতে চলিবে না কোনরূপে
যখন করেছে এ ভারত অধিকার ইংরাজ ভূপে।

ইংরেজ আসবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীকবির প্রাণে সন্দেহ জেগেছিল যে আমাদের ধর্ম, আচার বিচার কিছুই থাকবে না। এ সকল জাতির বিচার ভুলে 'এক জাতি এক প্রাণ' হতে হবে।...ভারতের মধ্যে বাঙ্গালী কবি এই মর্মসত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের ধর্মের গোঁড়া পণ্ডিতগণ শিকল দিয়ে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পল্লীবাসীদের ওপর নানা বিধান প্রয়োগ করতে লাগলেন। সেই সময়ে জাতির যে জাগরণের শিখা জ্বলেছিল তা আমাদের উচ্চ সমাজ পঙ্গু করে দিয়েছিলেন। আজ যাঁরা দেশকে বিদেশী শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন তাঁরা কেউই জাতের বিচার মানেন নি। বর্তমানে আমরা স্বাধীন হলেও এখনও নানা কুসংস্কারে পঙ্গু, তা থেকে উদ্ধার না হতে পারলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে।

এ সময়ে বহু পল্লীকবি দেশের ও সমাজের জড়তা, অনাচার ও অত্যাচার দেখে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। একদল পল্লীকবির কণ্ঠে শোনা যায়—

প্রাণে জ্বালতে গেলেই বোলতে হয়
পোড়া দেশের লোকের আচার দেখে
চোলতে পথে কাঁর ভয়।

কবি দশরথি রায়ের সমসাময়িক আরেকজন কবির গানের অধিনায়ক হুগলীর রসিক চন্দ্র রায়ের নাম করা যেতে পারে। তিনি নানা ধর্মবিষয়ক গীত ও

সমাজ সংস্কারের গান রচনা করে বিশেষত পশ্চিমবাংলার জনগণের কাছে পরিচিত হন। পশ্চিমবাংলার আর যে সকল কবিওয়ালাদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে এন্টনি ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা, চন্দননগরের রাসুসিংহ ও শালিখার রাম বসু সুবিখ্যাত। পশ্চিমবাংলার কবিওয়ালাদের গানের অশ্লীলতা দুষ্টের জন্য একে অচিরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। বঙ্গবাসী প্রেস থেকে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে বহু কবিদের জীবনী এবং গীতের পরিচয় পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের নতুন ধারায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রামে যে সঞ্জীবনী সুধা ঢেলেছিল তা এখনও কালীকীর্তনে বা রামপ্রসাদের গানে, পল্লীর প্রতিটি জনগণের প্রাণে শান্তিসুধা ঢেলেছিল। এই গানের মধ্যে হিন্দু সাধকগণ উদার দৃষ্টিতে সকল জাতিকে এক মাতার সন্তান বলে মনে করেন। বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্তের বড় বড় মূল সূত্রগুলি সরল সহজ সাধনার মধ্য দিয়ে সুমধুর গীতের ঝঙ্কারে সমগ্র জাতিকে সমণ্বয়ের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। নিরক্ষর পল্লীর শাক্ত সাধক কবিরা কাপালিক ও উগ্র শাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করে বৈষ্ণব ও শাক্ত গানের সমন্বয়ে এক নতুন দর্শন তৈরী করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বহু রকমের লোকসাহিত্য ও গানের মধ্যে ছড়া, পটুয়া সঙ্গীত, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, বানের ছড়া এবং রাস্তার পাঁচালী গ্রামীনজনগণকে অভিভূত করেছিল। বাংলায় এক সময় ছড়া খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এটি বাংলার মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তি।

নারীরা শিশুদের আনন্দ উৎপাদন এবং মনোরঞ্জন করবার নানা উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁদের স্বরচিত ছেলে ভুলান গান, ব্রত আর বিবাহ সঙ্গীতগুলি খুবই আনন্দদায়ক। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত 'লোকসাহিত্য' থেকে একটি ছড়া উদাহরণস্বরূপ দিলাম।

এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনা তলায় বসে
এখন কেন কাঁদো বাবা গামছা মুখে দিয়ে,
আমরা যাব পরের ঘরে পর অধীন হয়ে।
পরের বেটি মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে,
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।

এই ছড়াটির মধ্যে যেমন রসিকতা আছে তেমনি গভীর ভাবও আছে। পণপ্রথা বাঙ্গালীর সমাজকে কিভাবে জর্জরিত করেছিল তা আজও সকলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বহু গ্রাম্য ছড়া গান রচিত হয়েছিল।

বাংলায় স্ত্রী আচারের সঙ্গে পুরনারীগণ নিজ নিজ সামাজিক অনুষ্ঠানে

বহু গান রচনা করেছিলেন। এর ভেতর বিবাহ সংগীতগুলি খুবই প্রাধান্য লাভ করেছে যেমন জলসওয়ার গান, বিবাহবাসরের গান প্রভৃতি। শুভকাজে এয়ো নারীরা কত যে কথা ও গান মুখে মুখে গেয়ে যেতেন তার শেষ নেই, তাছাড়া তাঁদের আলপনা শিল্পের কাজ অনবদ্য।

শিশুসাহিত্য নাম ধারণ করে যে সাহিত্য শিশুদের মনোরঞ্জন করবার জন্য সর্বদাই উৎসুক তা নারীদের সৃষ্টি। যে হাতে মা শিশুদের দোলনা দোলায় সেই হাতে শিশুদের মানুষ করবার জন্য নানা রূপকথা সৃষ্টি করেন। তাঁরা এই শিশুদের চোখে নতুন আলো ও বুকে নতুন আশার সঞ্চার করেন তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পাঁপড়ির মত খুলে যায়। এর সৃষ্টিকর্ত্রীদের নাম বড় জানা যায় না। প্রত্যেক মায়ের প্রাণে শিশুর জন্মের মত রূপকথা জন্মগ্রহণ করে। এর মধ্যে যে রোমাঞ্চকর, উৎসাহ প্রীতি ও প্রেম প্রভৃতি মানুষ হবার উপকরণ যোগায়। প্রথমে লালবিহারী দে রূপকথা সংগ্রহ করেন। তারপর দক্ষিণারঞ্জন এবং আরও অনেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ডঃ দীনেশ সেন 'রূপকথা' সম্বন্ধে বলেছেন, "The Rupkathas or folk tales used to be told in the evening by professional story-tellers who are generally flower women or barber women". রূপকথা নারীরা যে সৃষ্টি করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর সাল তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের রূপকথা যদিও অলীক বা অবাস্তবের মধ্যে পর্যবসিত তাহলেও এর মধ্যে সত্যকার উপমা পাওয়া যায়। তাঁদের যেমন নিপুণ হাতে আলপনার নব আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল সেরকম কথার মধ্যে Creative Art-র সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা রূপকথা ব্যতীত বহু কথাশিল্পের আমদানী করেছিলেন। পৃথিবীর সৃষ্টি, মানব জাতির সৃষ্টি, জীবজগতের সৃষ্টি এরকম কত কথা।

মানুষের মনে এমন একটা সময় আসে যখন দুর্দমনীয় সংসারের নিয়মকানুনের বাঁধন ছিঁড়ে শূন্যে উড়ে যেতে চায়। তখন কোন বাধা বিপত্তির কথা মানে না। তাঁদের উচ্ছল যৌবন তরঙ্গ রোধ করবে কে? সে বাঁধা-ধরার বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় নৃত্যগীতে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। এরকম গীতিনাট্য বাংলার জনপদের গাঙে প্রেমের গীতের জোয়ার ডেকেছিল। তা কালের ঘূর্ণায়মান চক্রে চূর্ণ হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীরশেষে নানা রাজনৈতিক কারণে গ্রামগুলি ছারখারের সঙ্গে সঙ্গে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যদিও প্রাচীন লোকসাহিত্যের প্রাচীন স্মৃতি জেগেছিল তা বিংশ শতাব্দীতে নানা কারণ আর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে একেবারে নষ্ট

নিকেরা উচ্চস্তরের দর্শনবিদদের মত কেবল হতাশা দেখেন নি। মানুষের দুর্গতিতে তাঁরা সান্ত্বনা দেবার প্রয়াসে বার বার বলেছেন 'মানুষ জীবনে দুর্বিপাক দেখে মুক্তি চায়। মুক্তির কোন অর্থ নেই। আমরা পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ কাজেই আমি ছাড়া সে নেই, সে ছাড়া আমি নেই। তারা যেন শূণ্যকুম্ভ। সেই জন্যে প্রেমের জলধির অতলতলে ডুবে প্রেম জাহ্নবীর সুধা পান করে।' বাংলার সহজ পথের পথিক এই বাউল আজও নিজেদের স্বাতন্ত্রতা রক্ষা করে এসেছেন। তাঁদের মত কীর্তনীয়ারাও পুঁথিপত্র শাস্ত্রবিধি সকল তুচ্ছ করে মানুষের প্রেমের মধ্যে মুক্তির সাধনা করে গেছেন।

বাংগালী সহজিয়া সাধকগণ সুর ও কথা মিলিয়ে অপূর্ব সংগীতের সৃষ্টি করতে পারেন। এমনটি কেউই পারেন না। সেটি প্রেম ভক্তির সংমিশ্রণে ভক্তের প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়। যেমন রসের আঠায় পিঁপড়ে রস আস্বাদন করতে করতে মরণকে বরণ করতে দ্বিধা বোধ করে না তেমন ভক্তও ভগবৎ প্রেমের রসে আপ্লুত হয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে ভগবৎলীলা দর্শন করতে থাকেন। কীর্তন গানের মূল অনুপ্রেরক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। যাঁদেরকে বৈষ্ণব অনন্ত প্রেমের আধার বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ব্রজধামে এবং মথুরায় যে লীলা করেছিলেন তাঁদের ভাবজগতে সেই স্বরূপ দর্শন করতে ভক্তগণকে এক মহাভাবরাজ্যে নিয়ে যায়। মানব হৃদয়ে যে ভগবদমুখী ভাবসম্পদ আছে তার লৌহ কপাট কীর্তনের অপূর্ব ভাব প্রেরণায় খুলে গিয়েছিল। নদীয়া নবদ্বীপের পরম বৈষ্ণব সাধকদের কৃপায় আর মহাপ্রভুর নামের প্রভাবে কতশত পাপীতাপী কীর্তনের সুধামৃতে অবগাহন করে শান্তি পেয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবিখ্যাত খেতুরের মহোৎসবে শ্রীচৈতন্যধর্মের আন্দোলনের প্রথম ভাগে আবাল বৃদ্ধ বণিতা গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তা কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলার আপামর জনগণের মন হরন করেনি, সেই কীর্তন গানে বিমুগ্ধ হয়ে বহু ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পন্ডিত উপবীত ত্যাগ করে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ বিনা নিজেদেরকে অসহায় মনে করেন। কৃষ্ণই তাঁদের একমাত্র কাম্য। তাঁরা রাধাভাবে ভাবিত হয়ে নিজেদের বুদ্ধি, বিদ্যা, মান এবং ধন সকলই জগদপ্রভু কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করে থাকেন। সেই ভক্তদের কন্ঠ থেকে মধুর গীতগুলি সন্ধ্যায় কোন দেবালয়ে বা পল্লীর চন্ডীমন্ডপে খোল করতাল খঞ্জনী সহকারে ধ্বনিত হয় তখন মনে হয় যেন মর্তে স্বর্গ এসেছে। মহাপ্রভুর কীর্তন গানে গ্রামবাসীরা কেবল আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়তেন তা নয় তাঁদের কাছে সংসার অসার বলে মনে হত। কীর্তন গান করতে করতে ভক্তগণ

অশ্রু বিগলিত নেত্রে ধুলায় লুটাত। বৈষ্ণব ভক্তগণ সামাজিক বর্ণের কলুষতা ত্যাগ করে সকল জাতকে আপন ভাইএর মতো বুকে টেনে নিয়েছিলেন। নৃত্য, গীত এবং অভিনয়লীলা সাধারণ পল্লীবাসীদের ভগবদ চিন্তাকে সর্বদা সজীব ও সজাগ করে রেখেছিল। তাঁরা যাত্রার মধ্যে নিজেদের অন্তরে ভগবদ চিন্তা সর্বদাই জাগ্রত করে রাখতেন। পশ্চিম বাংলার বৈষ্ণব সাধকগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ এবং নবদ্বীপকে গুপ্তবৃন্দাবন কল্পনা করতেন। কীর্তন গান আধ্যাত্ম জ্ঞানের পথে চালনা করে। সেই জ্ঞান এত গভীর তা সহজ মানুষের বোধগম্যের অতীত। তাই বৈষ্ণব কীর্তনীয়াগণ প্রেমের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রেম বুঝবার চেষ্টা করেছেন। পল্লীকবিরা হরগৌরী ও কৃষ্ণরাধার যুগল প্রেম-আলেখ্যে সহজ সুরে সাবলীল ভঙ্গিমায় শান্ত পল্লীকে মুখর করে রাখেন। তাঁদের গানগুলিতে ঘর সংসারের দুঃখ সুখের কথা ব্যক্ত হয়েছে। তাঁদের কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণ মিলন খুবই বিরহের। কঠিন সামাজিক বন্ধনে প্রেমিক যুগলের প্রেম মোটেই কেউ ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। সেরকম হরপার্বতীর কাহিনী তুলে ধরেছেন মর্মন্তুদ দারিদ্রের মধ্যে, গৌরীর পিতার ধনাভিমানে দরিদ্র শ্মশানবাসী শিবকে কিরকম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কন্যা সতী, সেজন্য পতির লাঞ্ছনা সহ্য না করতে পেরে দেহ ত্যাগ করলেন এবং শিবের স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা প্রভৃতি চিত্রগুলি আমাদের ঠিক সামাজিক পণ প্রথার জন্য হাজার হাজার গরীব কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতার লাঞ্ছনা, কন্যার মৃত্যুবরণ প্রভৃতি হৃদয়বিদারক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। সামাজিক কলুষতা যাতে নাশ হয় এবং সমাজে ন্যায় ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় তার জন্য পল্লীকবিরা গানের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। পল্লীকবি হরগৌরীর বর্ণনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন ছোট বড় সমস্ত বাধার ওপরে দাম্পত্যের বিজয়। হরগৌরী প্রসঙ্গে আমাদের একান্নবর্তী পারিবারিক সমাজের আদর্শ রমণীর এক সজীব চিত্র তুলে ধরেছেন। স্বামী দীন দরিদ্র ভিক্ষু যেরকমই হোক না কেন, রূপ-যৌবন-লাবণ্যবতী স্ত্রী তাঁর প্রতি ভক্তি প্রীতি ও প্রেম অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। তাই লোককবি স্ত্রীকে দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা এবং রিক্ত গৃহের লক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান তেমন রাধাকৃষ্ণের গান সৌন্দর্যের গান। এর মধ্যে যে অধ্যাত্মের তত্ত্ব আছে তা শাস্ত্র অনভিজ্ঞ জনগণের কাছে অবান্তর। কারণ তত্ত্ব যখন রূপকের ছদ্মবেশ ধারণ করে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে তখন সে আপন তত্ত্বরূপ গোপন করে। বাহ্যরূপেই সে সাধারণের হৃদয় হরণ করে থাকে। রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি

পদার্থ আছে তাহা বাংলার বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব, তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে সমান উপভোগ্য সেজন্য তাহা ছড়ায়, গানে, কথায়, যাত্রায় প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত হতে পেরেছে। প্রেমের কাছে সবই তুচ্ছ। দারিদ্রের মধ্যেও দাম্পত্য জীবনের আনন্দ অটুট থাকে তাহা অধ্যাত্ম প্রেমের স্পর্শে, দুঃখে মুহ্যমান নর-নারীকে সান্ত্বনা দেয়।

পশ্চিমবাংলায় বৈষ্ণবদের মত আর এক দল গায়ক আমাদের মরা গাঙে জোয়ার এনেছিলেন। তাঁরা সর্বসাধারণকে সামাজিক, নৈতিক, বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা দেবার জন্য দল গঠন করেছিলেন। প্রারম্ভে তাঁরা যে সকল গান রচনা করে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন তাতে বিদেশী শাসনকর্তাদের ভয় হয়। তাঁরা যে কোন প্রকারে এই কবিওয়ালাদের নষ্ট করবার জন্য অছিলা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কবিদলেরও বেশীদিন প্রতিপত্তি আর থাকল না। তাঁরাও সাধারণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড়লোকের আশ্রয়ে গিয়ে উঠলেন। তাঁরা কবিওয়ালাদের উচ্চ ভাবধারা গ্রহণ করলেন না। সারাদিনের কর্মক্লান্তি লাঘবের জন্য বৈঠকখানায় তাঁদেরকে স্থান দিলেন। এই বড়লোকদের আনন্দ বিনোদনের জন্যে তাঁরা অশ্লীল গান রচনা করতে লাগলেন। তাতে নিজেদের কাব্যশক্তির হ্রাস পেতে লাগল আর পূর্ববর্তী গুণীদের গানেতে নানা ভেজাল দিয়ে কোন রকমে পসার জমিয়ে রাখলেন। ক্রমশঃ দেশটা বিদেশীর চাপে দরিদ্র হয়ে পড়ায় আর বড় লোকদের আর্থিক অবস্থা পড়ে যাওয়ায় কবির গান আর এগোতে পারল না। যে সকল বড়লোক তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য রইলেন তাঁরা সুরার মত ঝাঁঝাল রস চাইলেন। মূর্খ কবির দলও প্রস্তুত হয়ে তাই পরিবেশন করে 'উচ্চৈস্বরে চার জোড়া ঢোল ও চার জোড়া কাঁশি সহযোগে সদলে' কর্ণবিদারক গানের লড়াই করে সর্বসাধারণের সুখ্যাতি অর্জন করতে চাইছিল, যখন এ রকম বীভৎসতা চলছিল তখন কলকাতায় হরুঠাকুর কবিওয়ালা দেখা দিলেন। তিনি কবিওয়ালাদের কলঙ্ক মুছাবার জন্যে বিশেষ সচেষ্ট হলেন। একদিন তিনি রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে পেশাদারী দলে সখ করে গাচ্ছিলেন। রাজা তাঁর গান শুনে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে এক জোড়া শাল দিতে গেলে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। তাতে রাজার কবিওয়ালা সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা জন্মেছিল তা কেটে গেল। তিনি তাঁকে সমাদর করলেন। রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের যত্নে ও উৎসাহে হরুঠাকুর পেশাদারী দল গঠন করেন।

পশ্চিম বাংলায় যেমন বৈষ্ণব গান আছে তেমন শাক্তগানের প্রভাবও দেখা যায়। শক্তির প্রভাব কলকাতার কালীঘাট থেকে বিভিন্ন স্থানে বর্তমান। এমন একটি

গ্রাম নেই যেখানে পাশাপাশি শিব, কালী ও বিষ্ণুর মন্দির নেই। হিন্দুরা এই তিনটি দেবতাকে সমানভাবে পূজা করেন। শিব ও বিষ্ণুর চেয়ে ভক্তেরা কালীকে ভয় করেন বেশী। তাঁদের ধারণা এই দেবী এতই শক্তিশালিনী যে মানুষকে যে কোন রূপে পরিবর্তিত করে দিতে পারেন। তাছাড়া কালীকে জগৎমাতা হিসাবে পূজা করে আসছেন। বাঙালী কালী, দুর্গা প্রভৃতি মায়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিন্তা করে যে সাধনার সৃষ্টি করেছিলেন তা তন্ত্রের সঙ্গে মেলে না। এ যেন মায়ের কাছে ছেলের আত্মনিবেদন। ভক্ত সন্তানেরা নিজের দেশের রূপকে মাটির মায়ের রূপ দিয়েছিল।

মাটির মা তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। শক্তির সাধনা ভক্তেরা গানের মধ্যে দিয়ে করে এসেছেন। আগমনী ও বিজয়ার গান যখন শক্তি সাধকের দল দ্বারে দ্বারে গেয়ে বেড়ান তখন শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্দরের গৃহবধূরা চঞ্চল হয়ে উঠেন। সাধকগণ মৃত্তিকার মাকে কেবল শক্তি রূপিণী রূপে পূজা করেননি তাঁকে সত্যই মানবীয় মায়ের মত পূজা করে এসেছেন। মায়ের চরণে ভক্তের দল কেবল অশ্রু দিয়ে অর্ঘ্য দিয়েছেন। প্রাণের দেবতা বাংলার কতশত সন্তান আত্ম-হুতি দিয়েছিলেন তার শেষ নেই। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষ্যাপা, রামকৃষ্ণ আরও কত সাধক। দেবী এখানে শুধু মাতা হয়ে তৃপ্ত হননি তিনি কন্যা আর প্রণয়িনী হয়েও বাংলাদেশকে ধন্য করে গেছেন। সাধক রামপ্রসাদ, দ্বিজদেব পেলেন কন্যারূপে আর রাঘবানন্দ পেলেন পত্নীরূপে। তাঁরা নিজেদের ষড়রিপুকে বলি দিলেন মায়ের যূপকাষ্ঠে। দেবীর সঙ্গে সহজ করে সম্বন্ধ পাতান কেবল মাত্র বাংলার ভক্তদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা কোনদিন বিরাট শাস্ত্র জাল বিছিয়ে নিজেদেরকে বন্ধ ঘরে আটকিয়ে রাখেন নি। ভক্ত জগদম্বাকে সহজে আপনার করে নিয়েছিলেন। এই মায়ের গুণগান করতে সন্তানরা অধীর হয়ে পড়তেন। মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরী ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে দেবীর নামে চমৎকার সব গানের পালা আছে। অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও আগে থেকে বাংলা দেশে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের দুটি স্রোত চলছিল শৈবনাথমত এবং বৌদ্ধ সহজ মত। এই দুটি মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথ পন্থী সন্ন্যাসীরা নিজেদের 'যোগী' বা 'কাপালিক' বলতেন। এঁরা কানে নরাস্থিকুন্ডল, কণ্ঠে নরাস্থিমালা, পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল এবং গায়ে ছাই মাখতেন। এঁদের সমাজে বড় ঠাঁই ছিল না। রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ তান্ত্রিকতার ভান ভেঙ্গে দিলেন। তখন আর তান্ত্রিক

যোগীদের স্থান হল না। তাঁরা সমগ্র মানব সমাজকে আড়ম্বরহীন এবং অহিংস নীতিতে মায়ের সাধনায় আত্মনিয়োগের উপদেশ দিলেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত সংমিশ্রণে এক নতুন সাধক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। কপালী সাধকেরা কারণ, গাঁজা প্রভৃতি মাদকতা ত্যাগ করে ডুব দিলেন নতুন ভাবের আলোকে।

পশ্চিমবাংলায় অপৌরাণিক দেব দেবীর পূজা অবলম্বনে বহু গান ও গাথার সৃষ্টি হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, সত্যপীর, চন্ডী, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবীকে নিয়ে যে গাথা সৃষ্টি হল তাহা সকল জনগণের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে ফেলে। পূর্বে পশ্চিমবাংলায় ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল। বর্ধমান ও হুগলী জেলার বাইরে এই পূজা বিশেষ দেখা যায় না, ধর্মঠাকুরের গাজন ঠিক চড়ক বা শিবের গাজনের সময় শোনা যায়। শৈব নাথ ধর্ম থেকে এ মোটেই পৃথক নয়। যেমন শিবের গাজনে নানা অনুষ্ঠান বা পর্ব আছে সেরকম ধর্মঠাকুরের পূজায় গান ও নাচ দেখা যায়। অর্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে মানিকরাম গাঙ্গুলি নামে একজন কবি ধর্মমঙ্গল নামে একটি গাথা রচনা করেন। ধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ময়ূরভট্ট এবং রমাই পণ্ডিত একটি মনোরম গাথা করে গেছেন। এছাড়া হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মনসার ভাসান প্রভৃতি গাথাগুলি শিক্ষিত সমাজে আদরণীয় হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় দামিনী চরিত্র নামে একটি গাথা পাওয়া গেছে, চন্দ্রকুমারদের উদ্যোগে দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহে আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে পূর্ববাংলার পল্লীগাথাগুলি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি-গোচরে এসেছিল। এরকম কোন গাথা পশ্চিমবাংলায় পাওয়া যায় নি।

যদিও পশ্চিমবাংলায় বিশেষ গাথার প্রচলন ছিল না তাহলেও চারণদের মত কবিদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে চুঁচুড়া, হুগলী, সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বানিজ্যের যে সুখময় বৈভব ছিল তার কথা এই সকল কবিদের গানে শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া পালা গানও প্রচলিত ছিল। এখনও উদ্ধারণ দত্ত, নদের নিমাই, রামায়ণ ও মহাভারতের এবং দেবদেবীর পালাগুলি গ্রাম্যজনগণকে আনন্দ দিয়ে থাকে। সেকালের দেবলীলাকে অবলম্বন করে যাত্রার প্রচলন হয়েছিল। কোন উৎসব বা পূজায় মন্দির প্রাঙ্গনে কিংবা নাটমন্দিরে বা মুক্ত প্রাঙ্গনে সখের দল কিংবা পেশাদারী দল যাত্রা করতেন।

পশ্চিমবাংলায় লোকগীতের মধ্যে পাঁচালী খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। লোকের মনোরঞ্জন করবার ছলে কবিওয়ালাদের মত পাঁচালীকার সমাজ জাতির নানা গলদ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার গরল সম্বন্ধে বহু গান বাঁধতেন। পাঁচালী-

কারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি দাশরথি রায়ের নাম করা যায়। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের শেষ শক্তিশালী কবিও বলা যায়। তিনি ছিলেন গায়ক, সাহিত্যিক এবং সমাজ সংস্কারক। সমগ্র পশ্চিম বাংলায় তাঁর নাম আজও ছড়িয়ে আছে। কয়েকখানি পুস্তক তিনি অনুরোধে পড়ে প্রকাশ করেছিলেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের তঁার কোনদিনই আগ্রহ ছিল না। নিরহঙ্কার কবি আপনাকে প্রকাশ করতে চাইতেন না। সহরের আবহাওয়ার অন্তরালে থেকে নিজের সরল জীবন যাপন করতেন।

দাশরথি রায়ের জীবনী সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'বাঁধমুড় ও পীলা দুই-ই বর্ধমান জেলার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। কবি গায়িকা অক্ষয় বাইতির নিকট শিক্ষা। বাইতিনী বয়সে বড় হইলেও দাশরথী তাহার প্রণয়ী ছিল। বাইতিনীর দলের দাশরথি গাঁথনদারের কাজ করিত।'

বহু পাঁচালীকারের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় এবং রসিক রায়ের নাম খুবই পরিচিত। তাঁদের কাব্য প্রতিভা দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন। পাঁচালীকার ও কবিওয়ালারা তৎকালীন সমাজের আবর্জনা পরিস্কার করে এক নির্মল ও কলুষহীন বাঙালী সমাজ সৃষ্টি করতে ব্রতী হয়েছিলেন।

দাশরথির আসল শিষ্য ছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২) তিনি কৃষ্ণ যাত্রা রচনা করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

হিজলিতে এক পাঁচালী কবি ছিলেন তাঁর নাম রসিকচন্দ্র মণ্ডল।

পশ্চিমবাংলায় লোককবিরা কৌতুকরসের গান রচনা করে চিরাচরিত একঘেঁয়ে গান থেকে কিছু রসের সঞ্চার করে বাঙ্গালীর শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন। এরকম হাস্যরসিক কবিদের মধ্যে রামানন্দের গাঁজার গান বিশেষ প্রসিদ্ধ, যেমন—

মনের গৌরবেতে চিনলি না রে আরে গাঁজাখোর। ধুয়া।
গাঁজার পাতা জলে ভাসে তাহা দেখি ভাঙ্গি হাসে
আর এক ভাঙ্গি বলে ওরে জাহাদ এইল মোর
ভাঙ্গি ঘরে শুঞা থাকে গগনেতে তার দেখে
আর ভাঙ্গি উঠ্যা বলে বালাখানা মোর।
রামানন্দ নাড়ার বলে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে
চক্ষে হয় ঘোর।

এ ধরণের রচনা যেমন তামাকু সেবনে কতখানি আনন্দ পাওয়া যায় তারও চিত্র গানেতে তুলে ধরেছেন। তাঁর এ রকমের গানের মধ্যে যেমন—

মা মৈলে যেন গুড়াকু তামাকু পাই। ধুয়া।
উঠি অতি নিশিভোরে হুকাটি লইয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছুই
কয়্যা যাব অয়েরে মৈলে যখন শ্রাদ্ধ করে
বংশ পট্যো টেন্যা ফেল্যা কোচড়ে তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ড দেয় তাই
দ্বিজে রামানন্দ ভণে স্থান দিও শ্রীচরণে
জোড়ানলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা যাই ॥

এ রকম হাসির গানে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিগম্বর, হটুরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি সংগীত রচয়িতার নাম করা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলায় গ্রামে গঞ্জে অজ্ঞাত নামা কত কবি কতশত গান মৌখিক রচনা করে গেছেন আজও কেউ তার হিসাব রাখেন নি।

বৈষ্ণব সাহিত্যে গ্রাম্য কবিদের দান

গ্রাম্য কবিরা যে সকল সাহিত্য প্রতিদিন গ্রামে, মাঠে, নদীর ঘাটে, হাটে, ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে তাঁদের পরিধিতে তৈরী করছে তা কেউ টুকে রাখে নি। এ মুখে মুখে সুদূর পল্লী থেকে পল্লীতে বিস্তৃত হয়েছে। গ্রামবাসীদের ভেতর কৃষক, রাখাল এবং মাঝি এরাই অপূর্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজকাল এদিকে ভদ্র শ্রেণীদের কিছু কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সম্পূর্ণ উদ্ধার হয় নি। আমাদের দেশে যত রকমের গান গীত হয় তাদের মধ্যে কীর্তন, বাউল, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী, জাগ প্রভৃতি গান যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি ভাব ও দার্শনিক তত্ত্বেও উচ্চ স্থান অধিকার করতে পারে। মানবের প্রাণের সহজ আবেগ এমন সরল কথায় পৃথিবীর অন্য কোন গানে আছে কিনা সন্দেহ। এখানে মানুষের মনে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম তন্ত্রী বেজে ওঠে। এককালে এই বাংলায় কত শত গান এবং প্রত্যেক গানের এক একটি রূপ ছিল তা বাঙালী ভুলে যাচ্ছে। পূর্বে গ্রামই ছিল প্রত্যেকের বাসভূমি। বর্তমানে গ্রামগুলি ধ্বংসের মুখে চলেছে। যেখানে বার মাসে তের পার্বণ লেগে থাকত এখন সে স্থান অরণ্যে পরিণত হয়েছে। মন্দিরে সাঁঝ দেওয়া হয় না, কেউ আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে কলধ্বনি করে না। চারদিকে কি বিভীষিকা, যেন সারা গ্রামে আর যারা বেঁচে আছে তাদেরকে ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে। হায়! একদিন এমন ছিল যখন ভিখারী 'জয় রাধে' বলে ভিক্ষা করতে আসলে কৌতূহলী গৃহকর্ত্রী থেকে নবগুণ্ঠিত বধূগণ তাকে একটি কীর্তন গাইবার জন্য অনুরোধ করত। ভিখারী খঞ্জনী বাজিয়ে কত রসমধুর গান গেয়ে সকলে চিত্ত বিনোদন করত আর খঞ্জনীর তালে তালে গান আরও শ্রুতিমধুর হয়ে আরও শ্রোতা ডেকে আনত। চাষীরা সারাদিন খেটে খুটে এসে সন্ধ্যার সময় সকলে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে কীর্তন গেয়ে তাদের সুখ দুঃখের বোঝা শ্রীগোবিন্দের চরণে নিবেদন করে হৃদয়ের ভার লাঘব করত।

কেবল বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষ এই রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব রূপে ও লীলায় মুগ্ধ হয়ে তাদের মান, প্রাণ ও ধন সকলই তুচ্ছ জ্ঞান করে ব্রজধামে গিয়ে সন্ন্যাসী হতেন। বৈষ্ণব উচ্চসাহিত্যে মীরা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি পদকর্তাগণ

যেরকম উচ্চভাবাপন্ন সহজিয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিলেন সেই গ্রাম্য কবিগণ বৈষ্ণব লোক-সাহিত্যে অমর দান করে গেছে তা আমাদের বঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বৈষ্ণব উচ্চাঙ্গীণ বৈষ্ণব পদাবলীতে যে উচ্চভাব ও ছন্দঝঙ্কার আছে সেরকম গ্রাম্য কবিতার মধ্যেও সেই ভাব বহন করে আনে।

বাংলা গ্রাম্য বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রামের নিরক্ষর কৃষাণদের মুখ থেকে বের হলেও তাতে কোন ভাব ও সৌন্দর্যের অঙ্গহানী হয়নি। এ সকল গান প্রথমে বাংলার কবির দল গেয়েছিল। এই কবিদলের গান বৈষ্ণব সাহিত্যে যা রেখে গেছে তাতে অনুপ্রাস বা ব্যাকরণের ধার ধারে নি। এদের কবিতায় এমন রাগ আছে যা শ্রোতাদের আপনা থেকে মুগ্ধ করে। এই কবির দলের রচিত বৈষ্ণব সাধকদের প্রধান উপাস্য দেবতা 'রাধাকৃষ্ণ' তাঁদেরকে নিয়ে নানা ভঙ্গিমায় নানা গানে শ্রোতাদের মুগ্ধ করত। কবির দলের প্রধান গানের নায়িকা রাধা ও তাঁর সখীজনকে নিয়ে নানা শৃঙ্গার রসের জন্য কবির গান আর বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারলা না। যারা রাধাময় জগৎ ও যাদের রসজ্ঞান আছে, তারা এ সহ্য করতে পারল না। কবির গানের সম্মান যেখানে উচ্চস্তরে ছিল ক্রমশঃ উৎকট মাধুর্যহীন নারীদের নিয়ে নানা রকমের অবিমৃষ্যকারিতা ও মিথ্যা অলঙ্কার দেবার প্রয়াস হয়েছে।

বাংলার চতুর্দশ শতাব্দীতে যে নব সাহিত্য জেগেছিল তা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও মুসলমান ধর্মের প্রচারে অপরদিকে বাংলা ভাষায় ধর্ম প্রভাব এদুটি কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নব ভাবে জাগ্রত হল। চৈতন্যদেবের পূর্বে বাংলা দেশ কেবল সংস্কৃত চর্চা নিয়ে থাকত, সেজন্য সাধারণ ব্যক্তিদের ওপর তেমন দৃষ্টি ছিল না। চৈতন্যদেব যখন তাঁর নব ধর্ম সারা বাংলা ও ওড়িষায় প্রচার করলেন তখন বাংলার প্রাণে নব ভাবের জোয়ার এল, তারপরে গ্রাম্য কবিরা রাধাকৃষ্ণের রূপ এবং চৈতন্যদেবের নামকীর্তন করে তাদের জীবন সার্থক করত। চৈতন্যদেবের আগে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের চাপে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী অকূলে ভাসছিলেন। চৈতন্যদেবকে পেয়ে তাঁরা অকূলে কূল পেলেন এবং তাঁদের জীবন সার্থক হল। চৈতন্যদেব যে প্রেম ধর্ম প্রচার করলেন তাতে পামর আপমর হিন্দু মুসলমান সকলেই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তাঁরই ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব সাধকগণ চৈতন্য ভাগবৎ, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করলেন। চৈতন্যদেব ঈশ্বর প্রেমের যে আদর্শ দেখিয়েছেন তা জগতে অতুলনীয় 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ

লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।' ঈশ্বরের সত্ত্বা তাঁর প্রতি অনুরাগ কল্পনার বস্তু নয়। এই অলৌকিক রস আস্বাদযোগ্য ও আস্বাদিত হয়েছে এই তিনি সপ্রমাণ করেছেন। তাঁর প্রেমে আজ বাংলাদেশ ভরপুর। বাংলার দূরে দূরান্তরে নগরে ও পল্লীতে ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গের নাম কীর্তিত। চাষা লাঙ্গল ফেলে, কামার হাতুরী ছেরে, তাঁতি বস্ত্র বয়ন রেখে সন্ধ্যায় খোল করতাল নিয়ে বসে। বাংলায় এমন পল্লী নেই বললেও অত্যুক্তি হয়না যেখানে গৌরাঙ্গের নাম কীর্তন হয় না। সমস্ত বাংলা ও ওড়িষার তিনি মালিক। তিনি খুব বড় পণ্ডিত বা তার্কিক ছিলেন কিংবা কোন অলৌকিক কাণ্ড করেছেন, চাষাদের গানে তার উল্লেখ নেই, এমনকি তাঁর দিগ্বিজয়ী জয় কি ষড়ভুজ দর্শন প্রভৃতির কথা একবারও তারা বলেনি। তারা যে নিত্য সন্ধ্যায় তাঁর জন্য ভক্তি ফুলের অর্ঘ সাজায় তা সহজ সরল কথার সুরভি মাখা।

আমার গোরা জাতের বিচার মানে না রে
দেখবি যদি আয় সকলে
দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা
তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর
পেলাম না।
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে ফিরিতেছে পাগল হয়ে
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিবে না।
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে আর
প্রাণ বাঁচে না।

যিনি আমাদের অন্তরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গ, চিরসুহৃদ একমাত্র অবলম্বন, দুঃখের দিনের অবসানে যাঁর চরণকমল পাব বলে জীবন ধারণ, সেই পরম আশ্রয়, রূপেশ্বর প্রিয় বন্ধুর যিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোনার মানুষটির জন্য জাতীয় ব্যাকুলতা বাংলার শত সহস্র গ্রামে ফুটে উঠেছে।

এ দুটি চরণ হাটে মাঠে শোনা যায় 'ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গের নাম'। এ গান প্রত্যেকের মুখে আজও শোনা যায়। এতে কোন বাদ্যের প্রয়োজন হয় না বা সময়ের প্রয়োজন হয় না; যখন তখন বৈষ্ণব মাত্রই গেয়ে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় বাংলার হিন্দুগণ গৌরাঙ্গকে কত আপনার করে নিয়েছেন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে নিতাই এসে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁর অপূর্ব সাধনা ও জীবের প্রতি শিক্ষা, প্রেম ও কষ্টসহিষ্ণুতা সারা বঙ্গবাসীকে

এই নিতাই গৌরাঙ্গের সহোদর ভাই বলে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই একটি গ্রাম্য কবি গেয়েছে—

'এসো গৌরনিতাই তোমরা দুভাই
ও এসো এসো আমার কাছে,
বড় ভয় পেয়ে তোমাদের ডাকি
হায়রে গৌরাঙ্গ এস আমার কাছে
বাহুতে যে চাঁদ ধরব বলে, হায়রে সে চাঁদ
গগণে ছেয়ে গেছে
যমের হাতে দেখলাম হায়রে যম কি বেঁধে
লইতে আসে।

নিতাই গৌর ভ্রাতৃমূর্তির পরাকাষ্ঠা, তাঁরা যে বিরাট প্রেমের রূপ দেখিয়েছেন সেরকম কেউ দেখেনি। তাই বৈষ্ণবগণ তাঁদের নাম সংকীর্তন করে যে তৃপ্তি এবং হৃদয়ের মধ্যে শান্তি অনুভব করেছিলেন সেরকম তাদের দগ্ধ হৃদয়ে আর কেউ সুধারস ঢালেনি। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে ও ইতিহাসে নিতাইএর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি 'জগাই ও মাধাই' নামে দুষ্ট প্রকৃতির লোকের মধ্যে তাঁর হরিনাম সুধারস তাদের ওপর সিঞ্চন করতে তারা পশু প্রকৃতি থেকে মানবধর্ম বুঝতে পারল। তাই আজও শোনা যায় 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরেকৃষ্ণ হরে রাম'। এরই প্রতিধ্বনি গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক বৈষ্ণবের মুখে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি থেকে গ্রামকে বাদ দিলে চলবে না। কারণ সাধারণের মধ্যে যতক্ষণ না আমাদের কোন ধর্ম ও সংস্কৃতি পৌছচ্ছে ততক্ষণ তার মূল্য বুঝা যায় না। নিতাই আমাদের বাংলার যে কি সম্পদ রেখে গেছেন তা গ্রাম্য কবির গানে জানা যায়—

নিতাই আমার পরম দয়াল,
জীবকে হরিনাম বিলায়,
ও নিতাই জাতের বিচার করে নারে,
জীবকে হরিনাম বিলায়;
হরিনামের তরী নিতাই কান্ডারী
হরি নামে তরী বহে যায়।
নিতাই অদ্বৈত তাহার সহিত নিত্যানন্দ
রসনা,

লয়ে গঙ্গাধরে, এস কোলে কোরে হেরিয়ে
তাপের প্রাণ জুড়াই,
উজান বাতাসে মনের উল্লাসে সাধু মহাজন
পারে যায়।
আয় আয় তোরা'কে কে যাবি।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে জীবকে হরির
নাম বিলায়।

এই গানের মধ্যে কোন রসের বৈশিষ্ট্য হারায় নি। গ্রাম্য কবির গান সার্থক হয়েছে। নিতাই জাতির মধ্যে যে হীনতা এবং উচ্চ ও নীচ প্রভেদ তা ঘুচিয়ে কতখানি বাঙ্গালীর উপকার করেছিলেন এবং তামসিকদেরকে সহজ সরল করে কতখানি তাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিল উপরের গান থেকে বেশ বুঝা যায়। আজ তাই দেখা যায় বাংলার প্রতি গ্রামে সারল্যের প্রতিমূর্তি সামনে এসে দাঁড়ায়। বড় পণ্ডিত ও বিদ্বানের গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল। তাঁরাও 'তৃণদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' হলেন। সারা বাংলা ধন্য হল।

গৌরাঙ্গের আর একটি নাম ছিল নিমাই। কোন পণ্ডিত মনে করেন তিনি কৃষ্ণের পূর্ণবতার, তাঁর বাল্য লীলায় ব্রজের কৃষ্ণের সঙ্গে বহু মিল আছে। পাঁচ বছরের শিশু চৈতন্য গঙ্গার তীরে ক্রীড়া, লীলা-অতিশিশু মেয়েদের সঙ্গে খেলা ও কলহ করতেন, তা দেখে মনে হয় নদীয়া বৃন্দাবনে কোন তফাৎ নেই। একদিন এক অতিথিকে অন্ন দিলে তিনি যখন ঠাকুরকে নিবেদন করছিলেন সে সময় নিমাই এসে তাঁর অন্ন ভক্ষণ করেন। তিনি বললেন 'পূর্বে শুনেছিলাম যেন নন্দের কুমার'। নিমাই যখন সংসার ত্যাগ করে যান মায়ের মত পাড়া প্রতিবেশীর প্রাণে ভীষণ আঘাত লেগেছিল—জাগ গানে নিমায়ের বর্ণনা আছে—

'নিমাই দুঃখীনীর ধন,
দুঃখ পসরার বেটারে নিমাই ওরে
নীলরতন, ইত্যাদি

(জাগ গান উত্তর বঙ্গের প্রিয় গ্রাম্য গান। রাখাল বালকেরা সমস্ত পৌষ মাস ধরে রাত জেগে দল বেঁধে গান গাইতে থাকে। এই জাগ গান সোনাপীর, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করে রচিত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাখাল বালকদের গভীর যোগাযোগ আছে। কৃষ্ণযাত্রা বা গোষ্ঠযাত্রা ও গ্রাম্য যাত্রার তিনি নায়ক। রাখাল বালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে গান রচনা

করে গ্রামবাসীদেরকে গান গেয়ে শোনায় এবং যৎসামান্য ভিক্ষা পেয়ে থাকে।) শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণনামে পাগল হয়ে যেতেন। তিনি কৃষ্ণময় জগতে থাকতেন, তাঁর অপার করুণায় বাংলা ও ওড়িষা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান এই কৃষ্ণ-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই কোন গ্রাম্য ভক্তকবি গেয়েছে :

কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক মানুষ যেজন হয়,
তার চিহ্ন একটি আছে বটে, নয়ন দেখলে
কৃষ্ণ দুঃখী, কৃষ্ণ সুখী, কৃষ্ণ ভক্ত মানুষ দেখিজানা যায়
কৃষ্ণ কথা বলাবলি করে সর্বদায়,
জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ, গগন মণ্ডলে কৃষ্ণ
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ, এদেহে হয় উদয়।
আনে না সে অন্য কথা সর্বদাই কৃষ্ণ কথা
কৃষ্ণ কথা করে লতা, কৃষ্ণ গুণ গায়।
কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গ কার, বেড়ায় যেন পাগল প্রায়।
কবে হবে আশা পূর্ণ, সংসার হেরি শূণ্য,
সার করেছি শ্রীচৈতন্য, নন্দের নন্দলাল।
গোঁসাই অটল চাঁদ বলে, যে ভাব আছে
মধুর কাছে
সে ভাব কি তুই পারিবি পাগল,
এ ছেলের হাতের মোয়া নয়।

এমন সহজ সরল ভাষায় সাধনতত্ত্ব বুঝিয়েছেন তা থেকে পন্ডিত ও মূর্খ সকলেই শিক্ষা করতে পারবে। চৈতন্য কলিযুগে মুক্তির সাধনা নাম সংকীর্তনের মধ্যে দেখালেন। কৃষ্ণকে আমরা দেখতে পাইনি। বাংলা দেখিয়েছে শ্রীচৈতন্যকে, তাই দেখে তার জীবন সার্থক হয়েছে। এমন অপূর্ব প্রেমবিকাশ পৃথিবীতে কেউ কোনদিন দেখেনি। গীতায় শ্রীভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন সাধনের পথ দিয়ে, সেই সাধনের পথ অতি সংকট তা উচ্চমার্গদের জন্য, যারা পৃথিবীতে ভালমন্দ সবই বুঝেছে তাদের জন্য। সাধারণ লোকদের মত কিছু দেখায়নি। শ্রীচৈতন্যদেব সেই অভাব পূরণ করলেন। আমাদের নামের সঙ্গে ভগবানের নাম জড়িত, প্রতি পদে পদে আমাদের কৃষ্ণকে স্মরণ করে বলতে হয়। এমন কি মৃত্যু হলে 'হরিবোল' বলে শব বহন করে নিয়ে যায়। কলিযুগে কৃষ্ণচৈতন্য আমাদের উদ্ধার করবার জন্য এসেছিলেন, তিনি পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণুকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোথায় গেলে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাব। একজন মুসলমান কবি গেয়েছে—

বল দেখি কি বুধি করিব
কানুর পীরিত বড় পরমাদ
দৈবে মরিয়া যাব।

আমাদের অন্তিমকালে গুরু ছাড়া গতি নেই। গুরু ছাড়া কেউ মুক্তির পথ দেখাতে পারবে না। তাই একটি গ্রাম্য মর্মের সঙ্গে গেয়েছে—

আমার অন্তিমকালে শ্রীচরণ দর্শন দিও
আর কিছু চাই না গুরু ব্রজে যেতে
সঙ্গে নিও,
এ ত আমার জীর্ণ তরী
ভব সাগরে দিলাম পাড়ি
গুরু উপায় কি করি
যখন ঘোর তুফানে হেলবে তরী,
সে সময় কাণ্ডারী হইও।

উপরিউক্ত গানটি মুর্শিদী গান। এই গানের মধ্যে জীবনের সাড়া পাওয়া যায়। কবির, দাদু প্রভৃতি দোঁহার ভেতর এই সুর পাওয়া যায়। কীর্তনের ত কথাই নেই।

বাংলার বাউল কবিদের গান একদিন সারা বাংলাকে তাদের একতারা ও মিঠে সুরে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গ্রন্থে এর ব্যবহার পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে পাই 'বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।'

আমি বাটগানের একটি উদাহরণ দিয়ে উপসংহার করব। ঘাটু গান সম্ভবত যমুনার ঘাটের সঙ্গে এ গানগুলি যুক্ত বলেই ঘাটু নাম হয়েছে।

মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে ?
(ভোলা মন) সাঁতালি পর্বতের নীচে,
সেইখানে মন রায় আছে
কত সাধুর তরী যাচ্ছে মারা
পড়িয়া নদীর ঢেউ তুফানে,
রসিক যারা, পার হয় তারা
তারা নদীর ঢেউ চিনে ;
কত সাধুর তরী যাচ্ছে মারা
পড়িয়া নদীর ঢেউ তুফানে।*

* সিথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সাহিত্য শাখায় পঠিত।

প্রাচীন কবির গান

কবির গান বাংলায় একদিনে ভুঁইফুড়ে ওঠেনি, এ দিনের পর দিন বহু কাব্য রসের রস গ্রহণ করে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাংলার নিজস্ব যত রকমের সংগীত ও শিল্প আছে তার মধ্যে কবির গান বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। কত যুগের স্তরে স্তরে সংগীতের মাধুর্য বাংলার গ্রাম্য জনগণের ভেতর জমতে জমতে একদিন অগ্নুৎপাতের মত কৃষককুলদের মুখ থেকে উদ্গীরণ হতে থাকে। বাক্যের ভাব স্রোতে বাংলার প্রতিটি লোক যেন নতুন আলো পেল। মানবের জীবনের স্ফূর্তি সেই সঙ্গে তালে তাল দিয়ে নেচে উঠল। কবি গায়কদের প্রশংসা দেশদেশান্তরে ছেয়ে গেল। বাংলা তখন কাব্য জগতে খুব উচ্চ স্থান পেল। বাঙ্গলার এই কবি-সঙ্গীত থেকে গীতি কবিতা ও বহু নানা রকমের রসাত্মক, ভাবব্যঞ্জক ও নানা রসপ্রাধান্য কাব্যসৃষ্টি হয়েছিল। এই গানগুলি কেবল প্রাণের আবেগ ব্যঞ্জক নয়, এর মধ্যে ভাষা, ছন্দ, রাগ ও রাগিনী সকল সৌন্দর্য বর্তমান। এই গ্রাম্য সঙ্গীতের এমন সৌন্দর্য দেখে রাজা থেকে জমিদারেরা পর্যন্ত তাদের পৃষ্ঠপোষক হলেন। ক্রমশঃ কবির দলের মধ্যে ভেদ বিসম্বাদ হেতু দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রথমটি হল পাঁচালীর কবি এবং শেষটি দাঁড়া কবি। পাঁচালী কবির বিষয়বস্তু বৈষ্ণব ও শাক্ত সংগীতে আবদ্ধ ছিল আর দাঁড়া কবিদের কবিওয়ালা বলত। দাঁড়াকবি বা কবির দল রাজদরবার ও জমিদারদের মনোরঞ্জন করতে লাগল আর পাঁচালী কবির দল গ্রাম্য জনগণের কর্মক্লান্তি লাঘব করবার জন্য গ্রামের দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে বেড়াত। ক্রমশঃ গ্রাম্য চারণ কবির দলগুলি ধ্বংস হতে লাগল। একদিন তারা আমাদের দেশে জনশিক্ষার ভার নিয়ে পল্লীর অজ্ঞ মূর্খদের নানা জ্ঞানে আলোকপাত করত। বাংলায় কবির গান এক সময় যে রস পরিবেশন করেছিল তাতে বাংলার জনগণের পরম তৃপ্তি ও বহুকালের আশা পূর্ণ হয়েছিল। কবির গানের কাব্যরস কিছুদিনপরে জুয়াতে পরিণত হল সে সঙ্গে পেশাদারী কবির গান বেশীদিন বাংলায় টিকল না কারণ তাদের উপযোগী পয়সা দিয়ে গান শোনবার ধৈর্য তখন আর বিশেষ লোকের ছিল না।

আমাদের কিছু কবি দলের সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মেছিল তাতে আমরা তাদেরকে হীন করেছি। এই কবিগানকে অনেক পন্ডিত ব্যক্তি দুষ্ট বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অনেকে সঙ্গীতের বর্বর অবস্থা বলে প্রতিপন্ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'উপস্থিত মতো সাধারণের মনোরঞ্জন করবার ভার লইয়া কবি দলের গান, ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুন্য বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলংকার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে, ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ববতী শাক্ত এবং বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ সহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে জোগাইয়াছেন। তাহাদের যাহা সংযত ছিল এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ। তাঁহাদের কুঞ্জবনে যাহা পুষ্প আকারে ফুটিত এখানে তাহা বাসিব্যঞ্জন আকারে সংমিশ্রিত।' সবকবির দল যদিও এক প্রকার ছিল না, তাদের ভেতর উক্তির ও প্রেমের সৌন্দর্যকে অবহেলা করতে পারি না। মানুষের মন চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাকে নতুন ভাবে ও সৌন্দর্যে দেখানই কবিদলের সৃষ্টি। সব দলের মধ্যে দোষগুণ আছে কেবল একে দোষ দেওয়া চলে না। প্রায়ই দেখা যায় বাংলার কবিরদল কৃষ্ণরাধা বিষয়ক গান করতে খুব ভালবাসতেন তার কয়েকটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। দাঁড়া কবিগানের সখীসংবাদ, মাথুর বিষয়ক ও বিরহ গানগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শ্রোতারা শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন, মথুরার রাজা হওয়া, কুব্জার সঙ্গে মিলিত হওয়া, অক্রুরের ও বৃন্দার গমনাগমন ও সংবাদ আদানপ্রদান নিয়ে মাথুর বিষয়ক গানগুলি খুবই ভালবাসতেন।

রাম বসু— অজু সখি এ কি রূপ
নিরখিলাম হায়
নীর মাঝে যেন স্থির
সৌদামিনী প্রায়
ঢেউ দিও না কেউ
এ জলে বলে কিশোরী
দরশনে দাগা দিলে
হইবে সই পাতকী।

হরু ঠাকুর—কদম্ব তলে কে গো বাঁশী বাজায়
এতদিনো আমি যমুনা জলে
আমি এমনো মোহনো মুরতি কখনো

দেখিনি এসে হেথায়।

পরাণ সিংহ—দেখ দেখ হে শ্যাম
রাখ রাখ হে দাসীর সম্মান
এ গোকুলে
নারীর মধ্যে যে সতী আমি
সকলি জান তুমি
দীননাথ হে, কেন কর বঞ্চনা হে
ছিদ্র কুম্ভেতে বারি
যদি না নিতে পারি
তবু যমুনায় মরিব হরি হরি বলে।

লালু—কি আশ্চর্য্য কি মাধুর্য্য হেরিলাম কাননের মাঝে
ঐ নীরদবরণী ধনী কে গো নীলশতদল বিরাজে।
কই গো কুটীলে বলে দেখাও আজ সেই বনমালী
আর সেই কালী করে ধরে বাঁশী
মুখেতে হাসি, ঝরে কত সুধারাশি
বৃন্দাবনে কে শুনাবে বাঁশীর গান
কাজ নাই বেশভূষণে কৃষ্ণ বিনে এখনি ত্যজিব প্রাণ।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণরাধার প্রেম, তাকে লীলা বলা হয়েছে। তা খুব উচ্চ ধারণার অতীত। একে মনে মনে অনুভব না করলে তাকে বুঝা যায় না। মানবের মনের ক্লেদ ও দূষণীয় চিন্তা যখনই কৃষ্ণরাধাকে সামনে আনা যায় তখনই তা দূর হয়ে যায়। এমন চমৎকার অভিব্যক্তি অন্য কোন গানে আছে কি না সন্দেহ। হরু ঠাকুরের আর একটি গানে পাই কৃষ্ণের মথুরা গমনে বৃন্দাবন দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

মহড়া। একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত
কে আনিল রথ গোকুলে
রথ হেরিয়ে ভাসি অকুলে।
অক্রূর সহিতে, কৃষ্ণ কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে
রাধার চরণ ত্যজিলে
রাধানাথ কি শেষ রাধারে পাইলে।

খাদ। শ্যাম ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে

ব্রজাঙ্গণাগণে উদাসী
নাই অন্য ভাব শুনহে মাধব
তোমার প্রেমের প্রয়াসী।

চিতেন ঃ নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী।
তথা আসি গোপী সকলে

পাড়ন ঃ দিয়ে বিসর্জন কুলশীলে,

ফুকাঃ এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি।

মেলতা ঃ এই দোষে কি হে ত্যজিলে।

অন্তরা ঃ শ্যাম যায় মধুপুরী নিষেধ না করি
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার হাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে
ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও

চিতেন ঃ জনমের মত শ্রীচরণ দুখানি, হেরি
হে নয়ণে শ্রীহরি

পাড়ন ঃ আর হেরিব আশা না করি

ফুঁকা ঃ হৃদয়ের ধন তুমি গোপীসার

মেলতা ঃ হৃদে বজ্র হানি চলিলে

সেকালে কলকাতায় কবির লড়াই খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রত্যেক ধনীদের গৃহে পূজাপার্বনে তাঁরা দরদালানের অঙ্গনে কবিগানের ও কবির লড়াই-এর আসর বসাতেন। সেই সময়কার অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল কবি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হরু ঠাকুর, রাম বসু, নীলু, রামপ্রসাদ, এন্টনী ফিরিঙ্গি, বকু নেড়ে, ঠাকুর সিংহ, ভোলা ময়রা, বলাই সরকার যজ্ঞেসর, মতি পসারী, হোসেন, নিতাই, ভবানী বেনে, রামু, রামগতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব দল ছিল এবং একদল আরেকদলের সঙ্গে লড়াই-এ অবতীর্ণ হতেন। দুই কবির দল গোপনে মিলিত হয়ে চাপন উত্তর জেনে নিতেন।

কবিরদল যেমন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান বেঁধে ছিলেন তেমন তাঁরা ভবানী বিষয়ক, দুর্গার স্তব-স্তুতি পৌরাণিক এবং লৌকিক গান বেঁধে উপস্থিত শ্রোতাদের কণ্ঠে মুগ্ধ করতেন। আবার এর ভেতর নিজেদের ভেতর নানারকম কেচ্ছা করতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করতেন না। হরু ঠাকুর ভোলা ময়রাকে ভাল

ভাল গান তৈরী করে দিতেন তাতে রাম বসুর সহ্য হত না। তিনি একটি আসল ভোলা ময়রাকে আক্রমণ করলেন।

সকল ভন্ড কান্ড ভোলা তোর
তুই পাষন্ড নচ্ছার
তুই ভজিস ঢেঁকি
বলিস কি না গৌর অবতার
* * * *
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর
যিনি রাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ব্রজপুর।

এক সময় ভোলা ময়রা ঘাঁটালের কাছে জাড়াগ্রামে জমিদার বাড়ীতে কবিগান গাইতে যান। তাঁর প্রতিপক্ষ জগাবেনের সংগে লড়াই হয়েছিল তাতে জগা বেণে জমিদারকে শ্রীকৃষ্ণ আর জাড়াকে গোলক বলাতে ভোলা ময়রা তাঁর যথাযথ উত্তর তক্ষুণি গান বেধে দেন ঃ

কেমন করে বললি জগা
জাড়া গোলক বৃন্দাবন
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা
চৌদিকে দেখ বাঁশের বন।
জগা, কোথা রে তোর শ্যামকুন্ড
কোথা রে তোর মাণিককুন্ড
করগে মুলো দরশন।

সবচেয়ে ভোলা ময়রার সংগে এন্টনী ফিরিংগীর লড়াই খুবই জনপ্রিয় হয়ে কি গ্রাম বা কি শহর যেখানে তাঁরা দুজনে লড়াই-এ অবতীর্ণ হতেন তখন বহুদূর থেকে শ্রোতারা এসে ভিড় করত। এন্টনী তাঁর বিদেশী পোষাক ছেরে ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন আর নিজে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাই ভোলা ময়রা তাঁকে আক্রমণ করে গেয়ে আসর জমালেন ঃ

তুই জাত ফিরিংগী জবড়জংগী
আমি পারব নাক তরাতে।
তোকে পারব নাক তরাতে।
শোন রে ভ্রষ্ট বলি স্পষ্ট
তুই রে নষ্ট, মহাদুষ্ট
তোর কি ইষ্ট কালী কেষ্ট

ভজগে যা তুই যীশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জাতে।

ভোলাময়রার গানের প্রত্যুত্তরে এন্টনী বললেন—

সত্য বটে আমি জাতিতে ফিরিঙ্গি
ঐহিক লোক ভিন্ন ভিন্ন
অন্তিমে সব একাঙ্গী।
খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নেই রে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমার মানব জনম সফল হবে
যদি রাঙা চরণ পাই।

পরবর্তীকালে দাঁড়াকবিদের গান খেউড়ে পরিণত হয়েছিল তখন তাঁরা রাধাকৃষ্ণ এবং হরপার্বতীকে সড়িয়ে নাগর-নাগরী নিয়ে নানা অশ্লিল রসাত্মক গান রচনা করতে লাগলেন তাতেই জনগণের কাছ থেকে তাদের বিদায় নিতে হল।

যে সকল কবিরদল অশ্লীলতার নীচ ধাপে পা দেয়নি এবং নিজেদের আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা এবং আত্মসংযম করে চলতেন তাঁরা গুণীমানী ব্যক্তিদের কাছে বিশেষ সম্মানিত হতেন তাঁদেরই মধ্যে একজন হলেন হরুঠাকুর। কথিত আছে, কোন উৎসবের রজনীতে রাজা নবকৃষ্ণের প্রাসাদে এক পেশাদারী দলে হরুঠাকুর সখ করে গান করছিলেন তাতে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে পারিতোষিক স্বরূপ এক জোড়া শাল দেন। রাজপ্রাসাদে হরুঠাকুর আনন্দিত না হয়ে এতে অপমান বোধ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাল জোড়া ঢুলির মস্তকে নিক্ষেপ করলেন। এরকম ব্যবহারে রাজা তাঁর কাছে ধরে আনতে আদেশ দেন এবং শাস্তি দিতে মনস্ত করেন। তিনি গায়কের যজ্ঞোপবীত গলদেশে দেখে মাপ করেন। রাজা বাহাদুর তাঁর সম্মক পরিচয় পেয়ে গায়কের গুণগ্রাহক হয়ে বিস্তর সমাদর করতে লাগলেন। রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের যত্নে উদ্যোগেই হরুঠাকুর পেশাদারী দল করেন। ফলে উভয়ের অভিযানমূলক বিরোধভাবে প্রথম সাক্ষাৎ হলেও তাঁদের অবশিষ্ট জীবন সৌহার্দভাবে অতিবাহিত হয়েছিল।

রাজা নবকৃষ্ণ যতদিন বেঁচেছিলেন তিনি কবির দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, হরুঠাকুর, রামবসু, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঠাকুদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ কবির গান পরিচালনা করে কবিওয়ালা নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কবির দল ধর্মের ও সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে গান রচনা করত। একদিকে কবির গান যেমন বিরাট ভাব বিন্যাসের ও ধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল সেরকম অন্যদিকে তা মানবমনের আনন্দ দান, ঘরবৈচিত্রের খোরাক হিসাবে তৎকালীন জন সমাজের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কিন্তু সাধারনের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষা বিস্তার হউক না কেন তাহাদের আনন্দ বিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য এবং আবশ্যক সাধন ও অবসর রঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে, এখনকার দিনে খবরের কাগজ এবং নাট্যশালাগুলি শেষোক্ত প্রয়োজন সাধন করিতেছে।' কবিদলের গানে যে উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এক সুলভ অংশকারের বাহুল্য দেখা গেছে, আধুনিক সংবাদ পত্রে এবং অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিকে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়।

কবির গান বাংলার গ্রামে গ্রামে যে উপকার সাধন করত তা ভুলবার নয়। এ হয়ত উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষা সেবীদের আক্রোশে ও ঘৃণায় তাঁরা নানা কুৎসা রচনা করতেন। কিন্তু আসলে কবির গান তাহা ছিল কিনা সন্দেহ। চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গানেও বহু হীন প্রেমরসাত্মক কবিতা আছে তবে তা কেন আমাদের শিক্ষিত সমাজ এত সমাদর করে গ্রহণ করেছে? কবিওয়ালারা এতবেশী হীন রসাত্মক ভাব মেশায়নি লোক সাহিত্যের মধ্যে এই কবির গান শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে থাকবে। আমাদের বর্তমান বিস্বদমন্ডলী যদি কবির গান নিয়ে সবিশেষ যত্ন সহকারে পর্যালোচনায় ব্রতী হন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে আমি বিদ্বদ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাঁরা যেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার', অবিনাশ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রীতিগীতি' 'মনোমোহন গীতাবলী,' মন্নুলাল মিশ্রের সম্পাদনায় 'ওস্তাদি কবির গান,' দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান', 'বান্ধব', 'সৌরভ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা ১২৮৪ সালে গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৩০২ সালে জন্মভূমি ও সাধনায় কবিগানের আলোচনা দেখা যায় তাছারা রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ডঃ সুশীলদের **History of the Bengali Literature in the Nineteenth Century,** ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত প্রাচীন কবিওয়ালার গান অধ্যয়ন করলে কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে বিশেষ জানবার সুযোগ হবে। তখন বিদ্বদ সমাজ ভালমন্দ বিচারের একটি পথ খুঁজে নিতে পারবেন।

কীর্তন

মনোজগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেয় কীর্তন। মানবের মনে প্রেম উৎপাদন করবার শক্তি ভাববিহ্বল কীর্তনীয়ারা যখন গদ গদ কণ্ঠে গেয়ে যায় তখন সারা জগতের প্রাণী স্ত্রী ও পুরুষে একত্র হয়ে এক অপূর্ব অশরিরী আনন্দ উপভোগ করে। এই প্রেমের মধ্যে কোন কলুষ ও নিছক ভোগের বাসনা থাকে না। এর মধ্যে স্বর্গীয় প্রেম মন্দাকিনী অন্তর্প্রবাহমান। স্বর্গের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ কেবলমাত্র কীর্তনই নিয়ে আসে। হৃদয়ের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ প্রক্রিয়া একমাত্র প্রেমের উৎস থেকে নির্গত হয়। প্রাণের মধ্যে যখন এর বেগ খুব বেশী পরিমাণে বাড়তে থাকে তখন প্রেমিকের প্রাণ প্রেমবহ্নিতে পুড়ে যায়। প্রাণের ভেতর যে বৃহৎ মরু প্রান্তর আছে তাতে সকল সময়ই কত রকমের রসের নদী এসে পথ হারিয়ে ফেলে তার শেষ নেই। এর অতলতল মানুষের চিন্তার ধাতুও জমতে থাকে। এরকম যুগ যুগ থেকে ধাতুগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে একদিন প্রেমবহ্নির স্পর্শে অগ্ন্যুৎপাতের মত উদ্গীরণ করে ফেলে। এই প্রেম অগ্ন্যুৎপন্ন প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ ভক্তের মুখে কীর্তন রূপ ধারণ করে ফুটে উঠে। এ যার ওপরে বর্ষিত হয় তাকে পুড়িয়ে সোনা করিয়ে দেয়। আবেগময়, ভাবময় ও প্রাণময় গীত ভক্তের মুখ থেকে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল এবং ঝরণার মত প্রবাহিত হয়ে মরু প্রান্তরে হারানো নদীর সন্ধান দেয়। এ গানে কোন উন্মাদনা থাকে না তা ভাবে ভরপুর হয়ে সকল জীবের শিরায় শিরায় পৌঁছয়।

কীর্তন গান কৃষ্ণ ও রাধা এই যুগল মূর্তিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব ধর্মের আরাধ্য প্রতীক কৃষ্ণ ও রাধা তাঁদেরই লীলামৃত প্রচার করেছে। ভারতে এরকম গান আর কোথাও শোনা যায় না। এ গানের মধ্যে (১) শান্ত (২) সখ্য (৩) দাস্য (৪) বাৎসল্য (৫) করুণ এবং (৬) মধুর রসের সমষ্টি দেখা যায়। এ ছয়টি রস একত্র হয়ে যখন ভক্তের কণ্ঠ থেকে বেড় হয় তখন তা যেমন অপূর্ব তেমন মধুর। এ গানের মধ্যে ভক্তের আহ্বানে ভগবান সাড়া দিয়েছে। বিরাট অখণ্ড ভূমণ্ডলে নিরাকার চিন্তা করা একটি সাধারণ মস্তিষ্কে আসে না। সেজন্য কৃষ্ণ ও রাধার মূর্তি কল্পনা করে তাকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা।

ভক্তও ছয়টি রসের মধ্যে এক মনোভাব নিয়ে ডাকলে তার ডাকা সফল হয়। ভগবানকে নিজের নিত্য সহচর করবার জন্য সখ্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। ভক্ত মনে করে যে ভগবান সকল সময়ই তার সঙ্গে খেলা করছেন। পৃথিবীতে দুঃখ ও সুখ তাই ভক্তের কাছে সমান বলে প্রতীয়মান হয়। প্রাণ খুলে যেখানে হাঁসা, কথা কওয়া, খেলা, কৌতুক ও অন্যান্য যৌবনের নিগূঢ় বন্ধন ছিন্ন করে বহে যায় সেখানে স্বর্গের সুখ পাওয়া যায়। চারদিক আবেগে আচ্ছন্ন করে আছে। ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে তৃপ্তি কোনতেই পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবরা রাধাভাবে কৃষ্ণকে পূজা করবার রীতি উল্লেখ করেছেন। পুরুষভাবে যদি আত্মগরিমা আসে তাই তাঁরা নারীভাবে জগৎপ্রভুকে সেবা করাই শ্রেয় বলে মনে করেন। নিষ্কাম উপাসনা বাংলার জনপদে শ্রেষ্ঠ হয়েছে। কেবল একটুকু চরণের ধূলি পাবার আকাঙ্খায় সকল ধন, দৌলত, মান ও সম্মান বিসর্জন দিয়ে পাগলের মত ছুটে বেড়ায়। ব্যাকুল কণ্ঠে 'হা কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতে, গপেস গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে' বলে অশ্রুবিসর্জন করেন।

চৈতন্যদেব কীর্তন গানে মর্মস্পর্শী ভূমিকা টানলেন। তিনি যে অপূর্ব ভাব বিন্যাসে রাধাকৃষ্ণ নাম প্রচার করলেন তাতে বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষ প্রেমবন্যায় ভেসে গেল। শ্রীচৈতন্য অনুগত নিত্যানন্দ হরিনামের মাহাত্মে জগাই ও মাধাই নামে দুই পাপীকে উদ্ধার করেছিলেন। নিত্যানন্দ চৈতন্য কীর্তনকে নবরূপে সর্বত্র প্রচার করলেন। তাঁর মধুর কণ্ঠে ও প্রাণের আবেগে সকল জীব উদ্ধার হয়েছিল। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের আকুল আহবানে বাংলার জনসমাজের বহু কীর্তনীয়ার আবির্ভাব হল। কথিত আছে শ্রীচৈতন্য নীলাচলের জগন্নাথকে এতই কীর্তনে তন্ময় করেছিলেন যে তাঁর কীর্তন ব্যতীত জগৎপ্রভুর নিদ্রা হত না। তিনি নীলাচলবাসীকে এমনই মুগ্ধ করেছিলেন যে তারা কৃষ্ণ চৈতন্য নাম বিনা আর কোন নাম মুখে আনত না। এই নাম কীর্তন তাঁরা যে সুরের বৈচিত্রে প্রকাশ করেছেন তা যেন ঈশ্বরের অনুভূতিকে নিয়ে আসে। মানবগণকে মুক্তির সন্ধান ও পরব্রহ্মের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার একমাত্র তরণী এই নাম-কীর্তন। মানবের সহজে মুক্তি লাভের উপায় একমাত্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুই দেখিয়েছেন। তিনি গেয়েছেন এবং সকল মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন এই নাম গাইতে 'ভজ কৃষ্ণ নাম, জপ কৃষ্ণ নাম ও লহ কৃষ্ণ নাম ভাইরে'। তিনি পাত্র এমনকি অপাত্রে পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম বিলিয়েছেন।

বাংলার নিজস্ব লীলাকীর্তন বা কৃষ্ণকীর্তন স্বতন্ত্র ও ভাববিন্যাসের পরিচয়

দিচ্ছে। বেদে রাধা নামের কোন উল্লেখ নেই। রাধা নাম কেবল বাংলায় এবং কাশ্মীরে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রথম কৃষ্ণরাধা নামকীর্তন করেছে। এগারো ও বারো শতাব্দীতে কৃষ্ণ নাম কীর্তন খুব প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে পদাবলীকীর্তন গীত হত। এর মধ্যে এক নাটকীয় রূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের প্রতিটি লীলা যেমন দূতি সংবাদ ও সখীসংবাদ, ভূত বিরহ, ভবনবিরহ, ভাবী-বিরহ ও আসন্ন মিলন বিষয়ক আর আসন্ন-মিলন বিষয়ক অক্রূর সংবাদ, আসন্ন বিরহ বা বিচ্ছেদ বিষয়ক। এই নাট্যকাব্যের বা গীতিনাট্যের নায়ক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধা ও প্রতি-নায়িকা ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রমুখ অষ্টসখী। সখীসংবাদে সখীতে সখীতে এবং শ্রীরাধা ও সখীতে কথপোকথন। তার মধ্যে প্রশ্ন, উত্তর, পরামর্শ ও সংবাদ। দূতী সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ ও সখীতে কথপোকথন এগুলি পদাবলী কীর্তনের মূল বৈশিষ্ট। লীলাকীর্তনের মধ্যে গায়কভাববেশে আবেশের মধ্যে মানস চক্ষে দেখতে পান বৃন্দাবন লীলা ও রাসলীলা। শ্রীচৈতন্যদেবের নাম কীর্তনেও আমরা অভিনয়ের কিছু পরিমাণে দেখতে পাই। কৃষ্ণকীর্তনে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্তনে প্রধান রূপদান করেছেন পদাবলীকর্তাগণ যেমন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, দীনবন্ধু দাস প্রভৃতি। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কৃষ্ণকীর্তনে পদ লিখিত হয়েছিল।

(সাধারণ সমাজে কেবল মৈথিলী ভাষায় রচিত পদাবলী কিছুদিন প্রসিদ্ধ লাভ করলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত নাম কীর্তনের সংগে সংগে তাহা সাধারণ স্তর থেকে ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল, বাংলার জনসমাজের যখন এটি ভাল লাগে না তখন তারা নতুন পথের অনুসন্ধান করতে থাকে। ভক্তের মন-বাঞ্ছা ভগবান পূর্ণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে 'কৃষ্ণবিজয়' প্রণেতা মালাধর বসু বর্দ্ধমান জেলায় রাণীহাটী অর্থাৎ রেনেটী কীর্তন প্রবর্তন করেন। এটি হল বাংলার প্রাচীনতম ও সাধারণ শ্রেণীর কীর্তন। এর মধ্যে বিশেষ কোন তাল লয় কিংবা উচ্চশ্রেণীর কারুকার্য নেই। তারা সাবলীল ভঙ্গিমায় খোল ও করতাল সহকারে মধুর স্বরে গীত করত। বাংলার সাধারণ জগতে রেনেটী কীর্তন আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।) ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে' কীর্তনের নানা নাম পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন, "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলের ও গঙ্গাতীর্ত্তী শহর অঞ্চলের বিভিন্ন ঢঙের গীত পদ্ধতি ও গীতরীতি সুনির্দ্দিষ্ট রূপ পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জয়নারায়ণ ঘোষাল এগুলির এই তালিকা দিয়াছেন করুণা-

নিধানবিলাসে,

সংকীর্ত্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর
গড়াহাটী রাণিহাটী বিরহ মাথুর।
অভিসার মীলনাদি গোষ্ঠের বিহার
কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর।
পাঁচালি অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর
কত কথা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর।
ভবাণী ভবের গান মালসী মায়ুর
গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অংকুর
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর।
কলিয়দমন রাস চন্ডী যাত্রা ধীর
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপূর।
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর
বাঙ্গালার নব গান নূতন ঝুমুর।

পূর্বে কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে অবলম্বন করে গীত রচনা হত। পরে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে অবলম্বন করে বহু লোকগীত যেমন 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই সুরে সন্ধ্যা সকালে মাঠে, চন্ডিমন্ডপে এবং মন্দিরে শোনা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে কৃষ্ণকীর্তন বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে গীত হত। এর প্রভাবে হিন্দু ধর্ম নবজীবন লাভ করল। এমনকি বহু বিধর্মী কীর্তনের মাহাত্মে তন্ময় হয়ে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নব আবেদনে বাংলা ও উৎকল নিজস্ব গানের পরিচয় ফিরে পেল। মুসলমান শাসনকর্তাদের হিন্দু বিদ্বেষের ভয়ে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। তিনি অটুটভাবে সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের মূল মন্ত্র জীবে প্রেম, দয়া ও ক্ষমা প্রচার করতে লাগলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেতুরীর উৎসবে এই ধর্ম বহু পন্ডিত কীর্তনীয়াদের প্রভাবে নবজীবন ফিরে পেল। প্রাচীন উচ্চ সঙ্গীতগুলি বাংলার এক একটি জেলায় ভিন্ন ভিন্ন কলেবর ধারণ করল। বাংলায় কীর্তন বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রবর্তিত হল। জ্ঞানদাস প্রবর্তিত কাটোয়া জেলা থেকে মনহর সাহী উহা ঠুংরী আকারে গীত হয়। নরত্তম দাস প্রচারিত

রাজসাহী জেলা থেকে গড়ানহাটী, এর রূপ ধ্রুপদ এবং বিষ্ণুপুরের ঝাড়খন্ডী কিম্বা মন্দারণ ঠিক খেয়ালের আকারে গীত হয়। এ সকল উচ্চশ্রেণীভুক্ত কীর্তন বাংলার প্রাচীন উচ্চ সংগীত বিদ্যালয়ের খবর দিচ্ছে।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত কীর্তনে এ সকল ভিন্ন ভিন্ন রীতি দেখা যায়। তিনি বুঝেছিলেন যে বাংলার পক্ষে উচ্চ সংগীতরূপী কীর্তন বহন করবার শক্তি নেই। সেজন্য তিনি সহজ সরল কীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন। বাংলার জনমানসে জাগরণ আনবার জন্য তিনি 'নগর কীর্তন' প্রবর্তন করেন এবং প্রতি ব্যক্তিকে হরিনাম মন্ত্র দিয়ে 'নাম কীর্তন কেবলই মুক্তির পথ' এই কথা বুঝিয়ে দেন। এখনও নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন ধ্বনিত হচ্ছে।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর তিনটি পর্যায়ে কীর্তন বলতে থাকে (১) নাম সংকীর্তন (২) লীলাকীর্তন এবং (৩) রসকীর্তন বাংলায় কীর্তন গান থেকে উদ্ভূত ঢপ কীর্তনের প্রধান কবি ও সুরকার ছিলেন যশোর জেলায় উলুশিয়া গ্রাম নিবাসী মধুসূদন কান। তাঁর সরল অনুপ্রাস বিজড়িত সুরমাধুর্য সাধারণ শ্রোতাদের মুগ্ধ করত। কৃষ্ণ যাত্রায় এবং নতুন পাঁচালীতে ঢপ কীর্তনে প্রভাব দেখা যায়। ঢপকীর্তন একচেটে মেয়ে কীর্তনীয়াদের হয়েছিল। ঢপকীর্তনের কবি মধুসূদন কানের রচিত কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া হল!

রাজনন্দিনী পড়ল ধারায়
ওমা তোরা ধর আয় ধর আয়
কমলিনী আয়গো তোরা এরাই যেন যায় মথুরায়
কর দিয়ে দেখ নাসায়
বুঝি প্যারীর জীবন নাশ হয়
জীবন রইল যার আশায় সে যদি আসিয়ে বাঁচায়

পাঁচকড়ি দে সংকলিত মধুসূদন কিন্নরের বা মধু কানের ঢপ কীর্তন ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থখানি থেকে মধু কানের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানা যায়। তিনি লিখেছেন "মধু কান যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন উলুশিয়াই গ্রামে ১২২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম তিলক চন্দ্র কিন্নর। পিতার দারিদ্র্যবশতঃ বাল্যে কিছুই লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি অল্প অল্প পড়িতে পারিতেন বটে; কিন্তু অদৌ লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার সংগীতে সংস্কৃতমূলক শব্দবিন্যাস এবং অনুপ্রাস ও যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া একথা আমাদের নিকটে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার গীত রচনার আশ্চর্য

ক্ষমতা ছিল। যৌবনে ঢাকা নগরীর প্রসিদ্ধ কলাবিদ্ গায়ক ছোট খাঁ, বড় খাঁর শিষ্য হইয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অনন্তর ঢাকা হইতে যশোহর জেলার রাঢ়খেদিয়া নিবাসী রাধামোহন বাউলের নিকটে আসিয়া তিনি ঢপ-সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই ঢপ-সঙ্গীতেই আজ তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে কলঙ্ক-ভঞ্জন, মাথুর, অক্রুর সংবাদ ও প্রভাস বা কুরুক্ষেত্র (কেহ বা কুরুক্ষেত্র প্রভাস বলেন) পালা রচনা করেন। ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরের ঢপ গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাঁহার যকৃতে, বুকে ও পিঠে ভয়ঙ্কর বেদনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বরও দেখা দেয়। এই রোগে ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

মধুকান কয়েক বছর ঢপ কীর্তন দ্বারা বাংলার মনহরণ করেছিলেন। নিভৃত গ্রাম থেকে কোলাহলময় সহরে তাঁর সমান আধিপত্য ছিল।

গাজন

বাংলার শেষ উৎসব গাজন। সারা বাংলাদেশে গাজন মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে।

কলকাতা সহরে দেখা যায় প্রতি শিবতলায় এই উৎসব ঢাকঢোলের বাদ্য সহকারে হিন্দুর গৃহে এক নব ধর্ম ভাবের সৃষ্টি করে। সহরের গাজনের সন্ন্যাসীগণ সাধারণতঃ কারিগর ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত লোকেরাই সন্ন্যাস অবলম্বন করে। তারা গ্রাম্য প্রথা অনুসরণ করে গাজন ব্রত পালন করে থাকে। কিন্তু তারা পুরাণ প্রথা পালন করলেও অনুষ্ঠানগুলি গ্রাম্য রীতিতে মেনে চলে না। চৈত্র মাসের প্রথম থেকে ব্রতীগণ, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে, গেরুয়া বস্ত্র পরে, ফলমূল আহার, প্রতিদিন গঙ্গাস্নান এবং এক সন্ধ্যায় নিরামীষ আহার করে থাকে। এই ব্রত পালন দেখলে প্রথমে শাস্ত্রীয় ব্রত হিসাবে মনে হয়।

এক এক স্থানে গাজন এক একটি ভাবে উদযাপিত হয়। স্থান, পাত্র ও কালভেদে কেউ শিবের গাজন আর কেউ বা নীলের গাজন বলে থাকে। সকল স্থানে গাজনে সাত দিন ধরে আনুষ্ঠানিক পর্বের মধ্য দিয়ে চড়ক, ঝাঁপ, পুজো ইত্যাদি পালিত হয়। এই উৎসবে নিম্নশ্রেণী সন্ন্যাসী হলেও ব্রাহ্মণও তাদেরকে প্রণাম করে এবং এই সময়ে সন্ন্যাসীদের শিব বা নীলকে পুজো করবার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। আমি দেখেছি যখন সন্ন্যাসীরা প্রতি গৃহে এসে নীলের গান ঢাক ও কাঁসর সহযোগে ভিক্ষা করতে আসে তখন পুরনারীরা তাদের ফল উপহার দিয়ে, পা ধুইয়ে ও চন্দন দুর্বা এবং পাখার বাতাস করে পুণ্য সঞ্চয় করে। তারা মূল সন্ন্যাসীকে ঢাকের বাদ্য সহকারে ছোট শিশুদেরকে নিয়ে নাচ করতে অনুরোধ করে। নারীদের বিশ্বাস যে যদি শিশুদের ওপর নজর অর্থাৎ 'কু দৃষ্টি' থাকে তাহলে সেটি কেটে যায়। তাছাড়া চড়কে অন্যান্য লৌকিক আচার দেখা যায়। বহুদিন হল বান ফোঁড়া নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কলকাতার বিডন স্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাজারে এবং চন্দননগরে এখনও একজন ঢুলিকে চড়ক গাছে বেঁধে ঘুড়ান হয়। শতাধিক বছরের পূর্বেকার ক্ষীণ আভাস এই গাজন অনুষ্ঠানের মধ্য থেকে দেখা যায়। বাংলার এই গাজন পর্বে কুমীর তৈরী করে নীলের প্রতীক বলে মনে

করা হয়। এই উৎসবের মধ্যে লোকনৃত্য, গীত, চিত্রকলা ও ব্রতের একসঙ্গে সমাবেশ দেখা যায়। এ সময় চড়কের মেলা খুবই দেখার মতন। নানা স্থান থেকে পশারীরা বাঁশের, বেতের, মাটির এবং বর্তমানে প্লাস্টিকের খেলনা ও নানা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে পশার জমায়, মাঝে মাঝে পুতুল নাচ আর মনোরঞ্জনের নানা আয়োজন হয়। বাংলার মেলা থেকে যে শিল্প ও সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে তা গাজনের মধ্যে বেশ দেখা যায়।

বাংলায় 'বারমতী' ও 'গৃহভরণ' গাজনই অনুষ্ঠিত হয়। বারমতী অর্থাৎ গাজনের বারটী অধ্যায় ও তার আনুষঙ্গিক উৎসব প্রচলিত আছে। গৃহভরণ গাজন ধর্মপুরাণ মতে চলে আসছে। মানসিক থাকলে এই ব্রত করে। একটি কালো ছাগলকে সংস্কার করে থাকে। এই ছাগলের এক বছর সংস্কারের পর চার বা পাঁচ বছর পর গাজন হয়, একে 'কোল লুইয়া' বলে। একজন দানপতি নিযুক্ত হয় তার কথায় মানসিক শোধ এবং গাজন অনুষ্ঠান হয়। তিনি অসমর্থ হলে একজন প্রতিনিধি অর্থাৎ পটভক্ত্যা নিযুক্ত হয়। গাজন বেদীতে লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজা করা হয়। পুজায় চন্ডীপাঠ এবং রমাই পন্ডিতের শূন্য পুরাণ-পাঠ কোন কোন স্থানে আছে। ধর্ম পন্ডিত ভক্ত্যা ও আমিনীগণ (মেয়ে ভক্ত্যা) দ্বারায় ধর্মের পুজা করান হয়। এই উৎসবে ধর্মমঙ্গলের গান হয়। ময়ুর ভট্ট রচিত ধর্ম পুরাণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করে দিলাম :—

ধর্ম্ম গৃহাভরণে যে ফল পায় সবে।
শুনিলে সংজাত খন্ড সেখ ফল লভে ॥
পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানে শত ধেনু দান।
ততোধিক ফল পায় শুনিলে পুরাণ ॥
দ্বিতীয় চরিত্র খন্ড অতি সুললিত।
তাহাতে আছয়ে লাউসেনের চরিত ॥
পিতামহ তোমার লাউসেন গুণধর।
তাহার চরিত্র যত অতি মনোহর ॥
বারমতী নামে ব্যক্ত শ্রীধর্ম্ম পুরাণ।
কহিব তোমারে সেই অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
লাউসেন চরিত্র খন্ড নাম বারমতী।
সকল মঙ্গলদ ধর্ম্মের প্রিয় অতি ॥
প্রথম সতীতে আছে সৃষ্টি প্রকরণ।

বারমতী ও সংজাত এই দুটি গাজন বাংলায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সং-

জাত বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বারমতী পুঁথি চব্বিশ পালায় সমাপ্ত হয়। গায়কেরা প্রথম দিন বৈকাল বেলা ও দ্বিতীয় দিন সম্পূর্ণ গীত করে থাকে। পঞ্চমী থেকে একাদশীর মধ্যে কমিন্যা সন্ধ্যার কাজ শেষ করে রাত্রের গান করে।

সাধারণত গাজনের প্রথম দিনের উৎসবে মূলে সন্ন্যাসী গ্রাম থেকে গ্রামে ঢাক পিটিয়ে নরনারী এবং শিশু সকলের প্রাণে ভক্তির ভাব আনায়ন করে দ্বিতীয় দিনে সন্ন্যাসীরা শিবের মন্দিরে একসঙ্গে সমবেত হয়ে নৃত্য করে। এক 'নিজহর কামান' বলে। তৃতীয় দিন গঙ্গা বা অন্য কোন নদী থেকে মাটীর কলসী করে জল নিয়ে এসে গাজন মন্ডপে রেখে দেয়। চতুর্থ দিনে তার 'মহাহবিষান্ন' করে থাকে। সন্ধ্যায় সুসজ্জিত চতুর্দোলায় ধর্মের বা শিবের পাদুকা-কে স্থাপন করে আবালবৃদ্ধ বনিতা বাদ্য ও গীত সহকারে অন্য একটি গ্রামে মুক্তি আনায়ণ করতে যায়। সেই স্থানের ব্যক্তিগণ ধর্মের পত্নীরূপে মুক্তিদেবীকে দান করে। সেই স্থানে পুরোহিত মুক্তি 'অধিবাস' ও 'ধান্যের জন্মবিবরণ' বলে। তারপরে ধর্ম ও মুক্তিদেবীকে চতুর্দোলায় নিয়ে গাজন মন্ডপে স্থাপন করে পূজা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার করা হয়। পঞ্চমদিন অর্থাৎ গাজনের শেষ দিনে চড়ক পূজা হয়। শোনা যায় চড়ক গাছটি মাছের মত জলে সাঁতার কাটে, যতক্ষণ না তারা একে ধরতে পারে ততক্ষণ সন্ন্যাসীরা জলস্পর্শ করে না। চড়ক গাছটিকে পূজা করে তারপর একে পুনরায় জলে বিসর্জন দেয়। এই দিনে তারা সন্ন্যাস ব্রতের নিয়ম ভঙ্গ করে।

ধর্মভক্ত লাউসেন হাকন্দ তীরে নিজ দেহ নব খন্ড করে। নব খন্ড সেবা করেছিলেন। এজন্য কৃত্রিম হাকন্দ প্রস্তুত করতে হয়। এ সময় ভক্ত্যারা স্নান করে নতুন, অভাবে পুরাণ, শালবান, বান, জিহ্বান, ঝাঁপকন্টক ইত্যাদি নিয়ে ছাঁওলায় উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ গাজনের ঝাঁপকন্টক, সূচীমুখ, খঙ্গ, অর্ধচন্দ্র ক্ষুরধার ইত্যাদি অস্ত্রের যথাবিধি পূজা সমাপ্ত করলে, পটভক্ত্যা বা নব খন্ডকারী ভক্ত্যা বান বিদ্ধ করে। সংজাত এই নয়টি বান বিদ্ধ করতে অসমর্থ হলে, কেবলমাত্র জিহ্বান দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করা হয়। অধুনা সর্বত্র এ সকল নির্মম আনুষ্ঠানিক পর্ব নিষিদ্ধ হওয়াতে কেবল ধর্মানুষ্ঠানকারীগণ পাঠ, গান, পূজা ও ব্রত উদাযাপন করে থাকে।

(ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন "ধর্ম্ম-ঠাকুরের বা শিবের গাজন উৎসবে মূলে সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরিয়া যে তর্জা—ছড়া বলিত তাহার বিশিষ্ট নাম 'বোলান।') রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে

বাউল গান

লোক-সংগীতে যত রকমের গান আছে তার মধ্যে বাউল গান হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়কে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এ গানের ভেতর হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সাধনার মূল উপাদান আছে। বাউল সাধনার অতীত ইতিহাস আমরা বৌদ্ধযুগ থেকে সংগ্রহ করতে পারি। বৌদ্ধ ধর্মের ভাঙ্গনের পরও বাংলায় অনেক বৌদ্ধ সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল। যাঁরা নাথ অর্থাৎ যুগী বলে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁরা বৌদ্ধধর্মালম্বী ছিলেন। পরে হিন্দু ধর্মের সংগে মিশ্রিত হয়ে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেন। বাউল সম্প্রদায়ের সংগে নাথ সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য আছে। তান্ত্রিক যুগে তাঁদের ধর্ম বৌদ্ধ ও তন্ত্র সাধনার সংগে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট, উভয়েই মায়াবাদ স্বীকৃত। মুসলমান সুফীগণও কতকটা এইমত পোষণ করেন। বাউলেরা সুফীদের মত ভ্রমণশীল। বৌদ্ধ প্রভাবিত বাউল গান একটি বিশিষ্ট যোগসাধনার স্তর আবিষ্কার করেছিলেন। বৌদ্ধদের আলখাল্লা; লম্বা গেরুয়া রঙের পোষাক, লম্বা বাবরিচুল ও গোঁফ দাড়ি এবং সহজভাবে জীবনযাপন করবার প্রণালী বাউল-সম্প্রদায়ের ভেতর দেখা যায়। বাংলার সহজিয়া মতের প্রভাবও বাউল সম্প্রদায়ের দেদীপ্যমান। বাউলরা বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, হিন্দুদের ভক্তি ও সুফীদের প্রেম এই তিনটির সমন্বয় করে নব ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। শূন্যবাদ বাউলদের শূন্যতত্ত্বের ভেতর দিয়ে প্রচারিত।

বাউল সাধকেরা যে তন্ত্রোক্ত যোগও অভ্যাস করতেন তাহা তাঁদের উপাসনায় দেখা যায়। তাঁদের সাধনপ্রণালী উচ্চাংগের। ষটচক্রভেদ প্রণালীতে বাউল সাধকগণ শূন্যের উপাসনা করতেন। পদ্মাসনে বসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ রেখে অরূপের চিন্তা এই সম্প্রদায়ে প্রচলিত। তাঁদের এই সাধনা নির্বাণ লাভের উপায়। তাঁরা পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক কিছুই মানেন না। তাঁদের মতে পৃথিবীর বস্তু মিথ্যা। কেবলমাত্র অরূপই সত্য। তাঁরা এই অরূপের প্রেমে বিহ্বল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের শেষ চিহ্ন বাউল-সম্প্রদায় পরে হিন্দু ও মুসলমান মত গ্রহণ করে নব ধর্মের প্রচার করে। এই সম্প্রদায়মতে মানুষ উচ্চস্তরে উঠলে তাঁর আর কোন

সংসারের ওপর মায়া থাকে না। তিনি সব সময়ই ভাবে বিহ্বল হয়ে সাধনা করেন। এইরূপ সাধক 'পাগল' বলে অভিহিত। বাউলদের পরিচয় তাঁদের গানেই পাওয়া যায়। তাঁদের গানগুলি সকলে প্রাণ মন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবে ভরপুর করে তোলে। বাউলের গানের অন্তঃস্পর্শী মর্ম যাঁরা অনুভব করেন তাঁদের মনের আবদ্ধ বাতায়ন আপনি খুলে যায়। এই জ্ঞানের আলোকে মনের অন্ধকার নাশ হয়। বাংলার বাউল গান যে লোকের অন্তস্পর্শী এই তার কারণ।

বাউল-সম্প্রদায় গুরুবাদী অর্থাৎ গুরু-উপাসক। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র গুরুকে খুব উচ্চ সম্মান দিয়েছে। যতদিন না জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হচ্ছে ততদিন গুরু ছাড়া সব সাধনাই বৃথা। ইহকাল ও পরকালের পথ প্রদর্শক ও সকল জ্ঞানমার্গের নির্দেশক গুরু তাঁর সাহায্য ব্যতীত সকল সাধনা পন্ড। সাধনায় কাহার পক্ষে কোনটি সহজ পথ তাই নির্দেশ করে দেবেন গুরু। এই গুরু নির্বাচন করা কঠিন সমস্যা। তিনি আত্মদর্শন করিয়েছেন এবং পরলোকের খবর দিতে পারেন, তিনিই গুরু নামে অভিহিত।

নিম্নোক্ত বাউল গানটিতে গুরুর মহিমা প্রকট—

"গরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না।
গুরু তুমি হে খোদারই দোস্ত, অপারের কান্ডারী।
তুমি দেখা দিয়ে ওহে রছুল ছেড়ে যেও না।
ছেড়ে যেও না।
গুরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না।
গুরা আশা দিয়ে আনলে পথে, তুমি চল্লে গো
আসমানেতে
ওরে আসমানেতে আয়েণ ভারী আছে সান্তানা
আছে সান্তানা।
গরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাবনা।"

গরুর প্রতি অটল বিশ্বাস থাকলে সাধক ভবনদী পার হয়ে যায়। যে কোন বাধা-বিঘ্ন আসুক না কেন গুরুর নাম স্মরণ করলে সকলেই উহা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেন। বৈষ্ণব সাধনায়ও গুরুর স্থান খুবই উচুতে। এজন্য অনেকের ধারণা বাউলরা বৈষ্ণবদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৪শ শতাব্দীতে বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সময়ে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার জনসমাজকে প্রভাবিত করে। শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থে বাউলদের উল্লেখ দেখা যায়।

"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।

তখন বাউলরা বৈষ্ণবদের মত কৃষ্ণ ও রাধাকে আশ্রয় করে বহু গান রচনা করেছিলেন। তার একটি উদাহরণ দেখান হল—

আমি কোন কূলে যাই বলগো সখি।
এ কূলে থাকিলে পরে, গোপের কূলে পড়বে বাকী।
মান কূলেতে থাকলে পরে, সবে বল্‌বে মানানী,
এবার সম্পদে প্রাণ সঁপিলে পরে, হতে হয় কলঙ্কিণী।
এ কূলে গেলে সে কূল নাই, সে কূলে আর কিসের ভয়,
অটল কূলে কূল মিশায়ে, অটল হয়ে থাকি।
সবে বলে কূলে রব, অকূলে প্রাণ দিব গো,
অকূলের মধ্যে হাস্য, ঝিলিক্‌ দেয় কালা সোনা।
এ কূল গেলে সে কূল নাই, সেকূলে আর কিসের ভয় ?
প্রেম আগুনে জ্বলে মরি, ভেসে যাই তার করি কি।

বহু বাউল গান রচিত হয়েছিল জন্মে হিন্দু ও ধর্মে মুসলমান বাউলদের দ্বারা। তাঁরা খুব শিক্ষিত না হলেও কিছু কিছু লেখাপড়া জানতেন। বাউল গায়কদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লালন ফকির, সিরাজ সাঁই, পাঁচু ফকির ও অন্যান্য বাউল সাধকের কথা আমরা তাঁদের রচনা থেকে জানতে পারি। এ সকল সাধকদের রচনা যেমন গভীর তেমনি মরমী। বাংলার লোক সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে বাংলার সংস্কৃতি বাউল সাধকেরা ঘরে ঘরে বিস্তার করেছিলেন।

লালন ফকির ছিলেন অনন্য সাধরণ সাধক কবি। হিন্দু মুসলমানের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যাঁরা তাঁর গান নিয়ে অনুশীলন করেছেন তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। লালন ফকিরের দুটি গানে আমরা তাঁর হিন্দু-মুসলমানের প্রতি গভীর ভালবাসার নিদর্শন পেতে পারি—

(১) বল স্বরূপ কোথা ? আমার সাধের পৌরি
যার জন্য হয়েছিরে দন্ডধারী
রামনন্দের দরশনে, পূর্বের ভাব উদয়মনে,
এখন আমি যাই কার সনে সেই পুরী।
যদি তার সঙ্গে পেতাম, মনে সাধ জুড়াইতাম

সব সময় আনন্দে রইতাম সেইরূপ হেরি।
কোথা সে যমুনা এখন, কোথায় সে নিকুঞ্জ বন,
কোথা সে গোপীগণ আহা মরি !
গৌর চাঁদ অধীন বলে আকুল হই তিলে তিলে
লালন কয় এ সব লীলে সুখাধরি।

(২) হিরে মন জহরা কাটি ময়।
সে চাঁদ লক্ষ যোজন দূরে রয়
কটি চন্দ্র কোটী কোটী নয়, অনুকটী দেবতা সংগে আছে গাথা।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নারায়ণ জয় জয় ॥
ষোল চন্দ্র বেগে বজ্র বাগে ধায়, সে চাঁদ পাতলে উদয় ব্রহ্মতলে।
সে চাঁদ মৃণাল ধরে উজান ধায়।
ষল চক্র পারে আছে আদি বিধান, তাতে পূর্ণ রেখে
ষোল কলা ভেদ করে সপ্ততলা।
তার উপরে করে খেলা কালাচাঁদ
মহা সুখে বসে প্রভু করে গান।
যেমন সাধক হয় সে চাঁদ দেখিতে পায়,
সে চাঁদ মহেন্দ্র যোগে দেখা যায়।
নব লক্ষ ধেনু ধেনু রাখে রাখালে
চাঁদের সন্ধান যে জানে
সে দেখেছে বৃন্দবন চাঁদ ধরে
শ্রীরাধার শ্রীকমলে ভান্ড ভাংগে ননী খেতেন গোপনে
লালন ফাকরি করা নয়
ফিকিরে দরবেশ রাজ মইজদ্দি ছাড় দেয়।

বাউলগান কোন কোন জায়গায় মারফতী গান নামে পরিচিত। পূর্ববংগে হিন্দু ও মুসলমান বাউলদের মধ্যে আব্দুল্লা, আব্দুর রহিম, রশিদ, মনোমোহন প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত। বাউল গানের সংগে ভাটিয়ালী গানেরও মিল দেখা যায়। পশ্চিমবংগে বাউল গানগুলি বৈষ্ণব ভাবমূলক। উহা কীর্তন-রূপে আজও গীত হয়ে থাকে। বাউলরা বলেন যে বাউলগানে ইড়া, পিংগলা ও সুষুম্না নাড়ীর ভেতর থেকে সংগীত বের হয়। বাংলার লোক সংগীতে মুরশিদ

ফকির ও দরবেশের গান বাউল গানের অনুরূপ। বাউলরা একতারা বাজিয়ে গানের তালে তালে নাচও করেন। বাউল গানে বাংলার পল্লীসমাজ ও সাহিত্য অনেকটা প্রভাবান্বিত।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও বাউলের প্রভাব আছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বাউল বলতেন। তিনি লিখেছেন 'আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের কিন্তু ভাল করতে চেষ্টা করিনি। সেগুলো স্পষ্টতর রবীন্দ্র বাউল রচনা। তিনি বাউলের মুখে গান শুনেছিলেন ও বাউল বেশে তাঁদের প্রণালী অনুসরণ করেছিলেন। তিনি অশিক্ষিত বাউলদের গানে উপনিষদের মর্মবাণী শুনে বাউলদের মহত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছেন 'অন্তবতর হৃদয়ামাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন মনের মানুষ বলে শুনলুম তখন আমার মনে বিস্ময় লেগেছিল।'

লালন ফকির ছাড়া মদন ফকীর এবং আরও অনেক বাউলের দার্শনিক তত্ত্বের গান বড় বড় দার্শনিককেও নতুন পথ দেখাত। মদন ফকীরের একটি গান দিলে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

হে নিঠুর গরজী
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি,
মধুর বিহনে ?
দেখন আমার পরমগুরু সাঁই
সে যুগ যুগান্তে ফুটায় মুকুল,
তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচন্ড,
তাই ভরসা দন্ড,
এর আছে কোন উপায়
রে গরজী।
কয় যে মদন
শোন নিবেদন,
দিসনে বেদন
সেই গুরুর মনে,
সহজ ধারা
আপন হারা
তার বাণী শুনে
হে গরজী।

বর্তমানে বাউলদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এখন গ্রাম্য অশিক্ষিত বাউলরা বহু শতাব্দীর পূর্বকার সাধনার ধারা মাত্র বহন করে চলেছেন। বাউল সাধক পরম্পরায় তাঁদের গানগুলি মুখে মুখে চলে আসছে। এগুলি এখনও লুপ্ত হয় নি। তবে কালক্রমে যে লুপ্ত হবে এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা এই সম্পদ রক্ষা করলে লোক-সাহিত্যের মস্ত বড় সম্পদ ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা পাবে।

বাউল ও সুফী-প্রভাবান্বিত বাংলার লোকসঙ্গীত

কোন অতীত যুগ থেকে ভারত সাধনার অধিকারী হয়েছিল তা বলা যায় না। তার এ যেন নিজস্ব, তাই সে নিজের কোলে সকল জাতিকে স্থান দিয়ে শিক্ষায় ও দীক্ষায় গড়ে তুলেছিল। বৌদ্ধ যুগ থেকে ভারতে যে সাধনার ধারা চলে আসছিল, তার প্রভাব মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করত। বাল্যকালে সিদ্ধার্থের মনে যে প্রশ্নগুলি জেগেছিল তার উত্তরে তিনি অহিংসার যে মন্ত্র পেয়েছিলেন তা দিয়ে সকল এশিয়াবাসীকে অভিভূত করেছেন। তাঁর সন্ন্যাস ধর্ম, সাধনা, সত্য-উপাসনা এবং সেবা মানবকে সেই পথ অনুগমন করতে শিক্ষা দিয়াছিল। বুদ্ধের ধর্ম ক্রমশঃ তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রবেশ করে এক একটি নতুন সাধনার প্রবর্তন করল। বাংলার ধর্মঠাকুর বুদ্ধের আসন গ্রহণ করে এক অপূর্ব গীতের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতিকে দার্শনিক আসনে বসিয়েছিলেন। ধর্মঠাকুর পরে সূর্যদেবতা, শিব এবং বিষ্ণু নামে অভিহিত হলেন। এই দেবদেবীগণকে নিয়ে যে সকল কথা, গান এবং গাথা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বিশ্বের আদি, স্থিতি ও তন্ত্র-সম্বন্ধে নানা বিবরণ পাই। ভারতের সকল স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের লোপ হলে তার স্থানে জৈন, বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু এর মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এতে শিক্ষিত মনের খোরাক জমায়, কিন্তু অনুন্নত গ্রাম্য জনের কাছে তা অজ্ঞাত হয়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থেকে উদ্ভূত সহজিয়া-সাধন জনগণকে আপ্লুত করেছিল। এর অধিনায়কত্ব রমাই পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে যুগাবতার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের বাউল মনে করতেন। তাঁদের শিক্ষায় বাউল-সম্প্রদায়টি সকল ধর্মের বাহ্যিক আচরণ ছেড়ে দিয়ে অন্তরের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল। সেই কথাই বাউলদের গানের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। মধ্য ভারতে দাদু, কবীর প্রভৃতি সন্ত সাধকগণ যে দার্শনিক মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা বাউলরা বাংলায় প্রচার করেছে আরও অন্তস্পর্শী করে, এর মধ্যে বেদ, বেদান্ত ও সকল শাস্ত্রের সারাংশ সন্নিবেশিত আছে। এমন কি যোগদর্শনের প্রধান সূত্র বাউলদের ষট-চক্রে পাওয়া যায়।

তাতে দর্শনশাস্ত্রের কার্যকর দিকটির নিগূঢ় তত্ত্বের সংগে পরিচিত হতে পারি। তারা ষটচক্রের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও দেহের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তীকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টা করেছে। এর থেকে দেখা যায় বাউল সম্প্রদায় তন্ত্র মতের অনুসরণ করেছিল।

ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পেলেও বাংলায় সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। এর উত্তরাধিকার নাথযোগী প্রমুখ সম্প্রদায়ের ওপর পড়ল। বাংলা-দেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলায় যোগীরা পরে বাউল হয়েছিল। মধ্যে বিবর্তন যেন প্রচ্ছন্ন আলোর, অনেকে মনে করেন যোগীরা বৌদ্ধদের অপভ্রংশ অর্থাৎ তাদের শূন্যবাদের মধ্যে সহজবাদের একই পরিচয়। বাউলদের শূন্যতত্ত্ব বৌদ্ধ-ভাব ও বেদান্ত এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে গড়ে উঠেছে। উপনিষদের চিরন্তন সত্য বাণী 'অসংগম অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' তাদের গানে মূর্ত হয়ে ফুট উঠেছে। লালন ফকির সেই সত্য উপলব্ধি করে গেয়েছিলেন—

নিরাকারে ভাসছে রে ফুল
সে যে বিধি বিষ্ণু হর আদি পুরন্দর
তাদের সে ফুল হয়েন মাতৃফুল।

যোগী সিদ্ধদের সাধনার কথা, ধর্মপূজার উল্লেখ ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। এর ভেতর বাউলদের সন্ধান পাই। যেমন একটি পঙ্‌ক্তিতে আছে—

গুপ্তবেশে বাউলরূপে আছে এই ঠাঁই।
ইহারে করিবা চেলা রাজা গোবিন্দাই ॥

এ কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য আছে। যদিও এ ঘটনাগুলি অলীক, তাহলেও এর থেকে জানা যায় বাংলাদেশে রাজারাও সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। এ কাহিনী ভারতের সর্বত্র প্রচলিত আছে। বাংলার বাউলদের মত অন্যান্য প্রদেশের লোকগায়করা ময়নামতীর গান একতারা গোপীযন্ত্র সারেঙের সংগে গেয়ে থাকে। ময়নামতী তাঁর ছেলে গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি মায়ের আজ্ঞা পালন করে সিদ্ধযোগী জালন্ধরের শিষ্য হয়ে সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। তাঁর দুই রাণী উদুনা এবং পুদুনাকে ত্যাগ করে তিনি গুরুর কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন—

সংসার জলের বিম্বু সব মিছা মায়া।
এ তিন ভুবন দেখ আপনার কায়া ॥

ভিন্ন ভিন্ন তনুখানি বন্দি মায়াজালে।
জীবা মাত্র দিবা দশ সংহারিব কালে॥
ইষ্টমিত্র বন্ধুবান্ধব মিছা কায়।
কাষ্ঠের পুত্তলা যেন বাদিয়া নাচায়॥

কথিত আছে পট্টিকার জনপদ-আধুনিক ত্রিপুরা-বৌদ্ধ তান্ত্রিক পূজার পীঠস্থান ছিল, বাংলায় এখনও চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিগন বাস করেন। তাঁদের গীত ও কথা বুদ্ধের নামে সরাসরি জড়িত না হলেও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বৌদ্ধধর্মে বিশালতা ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বগুলি সরল ও অশিক্ষিত লোকদের গানের ভেতর বিদ্যমান। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ নাটকের অবসান ঘটল। চতুর্দশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম দেখা দিল। কিন্তু ইসলামীয়দের অত্যাচার ও ধর্মান্তরিত করার জন্য সাধারণ লোকদের হৃদয়-আকাশে যেন বৈশাখী কালো মেঘ উদিত হয়েছিল। সেই সময় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে অত্যাচারিত ব্যক্তিরা নতুন আলো দেখতে পেল। এমনকি বহু মুসলমানও বৈষ্ণবদের সরলতায় মুগ্ধ হয়ে তা গ্রহণ করেছিল।

মক্কা থেকে নবাগত অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ইসলাম-প্রভাবিত সুফীদের আবির্ভাব হয়। তাঁদের গুরুবাদ এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় ধর্মপ্রচার মুসলমানদের প্রাণে নব উদ্যম জাগিয়েছিল। ১১৪২ থেকে ১২৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় চিশ্‌তী সুফীধর্ম-প্রবর্তক খাজা মুইনুদ্দিনের শিষ্য আবদুল্লা কিরমানী নতুন নীতি প্রচার করেন। তাঁদের সুফিবাদ দার্শনিক তত্ত্বে অভিব্যক্ত। যথা—

অল হাজার অজ হুব্বে দুনিয়া অল হাজর।
বাহার নাচনা জার মাখোর হুনে জেগর॥

অর্থাৎ—পার্থিব ভালবাসা থেকে দূরে সরে থাক, ধন আর আহারের জন্যে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করো না।

পূর্ববঙ্গে সুফীদের প্রভাবে বহু দার্শনিক অর্থাৎ ফকির, দরবেশ, সাঁই, গুরুসত্য ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটল, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত বাউলরা ভাববাদের প্রবর্তন করলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বাউলদের কৃষ্টি প্রসারলাভ করেছিল। শ্রীচৈতন্য নিজেকেও বাউল নামে অভিহিত করেছেন। সেজন্য বাউলগণ বলেন—

তাইতে বাউল হইনু ভাই,
এখন লোকের বেদের ভেদবিভেদের
আর তো দাবীদাওয়া নাই।

তাঁরা গোঁড়া হিন্দুদের অত্যাচারে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের ধর্ম ক্রমশঃ বিশ্বপ্রেমমূলক হওয়ায় সাধারণে ইহা বুঝতে পারতো না, সেজন্য তাঁদের বাতুল অর্থাৎ পাগল বলত। কিন্তু তাঁদের মনোহরণ গীত সকলকে মাতোয়ারা করে তুলতো।

বাংলায় দুটি প্রচলিত ধর্মচ্যুত মানুষের দেখা হল বাউল ও সুফী। যেন দু'ভায়ের মধ্যে বহুদিন পর মিলন ঘটল। তাই বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। হিন্দুর শিষ্য মুসলমান এবং মুসলমানের শিষ্য হিন্দু— এমন করে পরম্পরা নেমে এসেছে। দুই দল প্রেমের জোরে নিজেদের বেঁধে দিয়ে বলল—

খোদে খোদা আল্লার রাধা দোস্ত মহম্মদ।
মনোমোহন ফিরেছেন খুঁজে হিন্দু-মুসলমান ॥
বিবি ফতেমা কালী, শিব হ'ল হজরত।
জল পানি বায়ু একই হরফ ॥

তাঁরা ধর্মগ্লানি থেকে জাতিকে মুক্ত করে সকলের মধ্যে সমদৃষ্টি, সমভাব এবং সমজ্ঞান প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের গানে ব্যক্ত হয়েছে—হিন্দুরা যাকে জল বলে, মুসলমান তাকে বলে পানি এবং খৃষ্টান বলে ওয়াটার-এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য নানারূপ জাল ফেলে রেখেছে। বাউল ও সুফীগণ যে সাধনা প্রচার করেছিলেন তা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিকতা থেকে ন্যূন নয়।

বাংলার বাউলদের পথ-অনুসরণকারী দরবেশ, সাঁই, কর্তাভজা প্রভৃতি লোকগায়কের উদ্ভব হয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেকেরই চিন্তাধারা থেকে বিশাল ভাব প্রবাহিত হ'ত। বেদ বহির্ভূত বাউল এবং কোরান-নির্বাসিত সুফী যে গান রচনা করে গিয়েছেন, তা এ দুটি ধর্মগ্রন্থের মন্ত্র থেকে বহির্ভূত নয়। ভারতীয় লৌকিক দর্শন ক্ষেত্রে বাউল, সুফী এবং সন্তদের দান অতুলনীয়। তাঁরা সকলেই মানুষকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন। তাই মুরশিদ গানে পাওয়া যায়—

মানুষ রতন দেখ হে সুজন, এই মানুষ ভজলে পরে,
এড়াবে শমণ, মানুষ মরে বলে না করে ঠিকানা।

এ যেন বেদমন্ত্রের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা-মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে—এই মানবদেহ ভুবনের মধ্যেই মহান দেবতা অধিষ্ঠিত। চিন্ময় বিশ্বদেবতা এই মানবদেহেই বিরাজিত।

বাউল ও সুফী এ দুজনকে দেখে মনে হয়, যেন তাঁরাই আসল ব্রাত্য শত শত বছর আগে থেকে নেমে এসেছে নতুন কলেবরে। দুঃখের বিষয় আমরা বাংলাদেশে তাঁদের সহজ বেদমন্ত্র পেয়েও হেলায় হারিয়েছি।

বাংলার লোকসংগীতে মালসী গান

বাংলার লোক সংগীতে মালসী গান বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মালসী গান বাঙালীর জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার তুলনা হয় না। আশ্বিনে দেবী দুর্গার আগমনে এক সময় সারা বাংলার পল্লীগুলি মালসী গানে মেতে উঠত। মালসী গান কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত যেমন (১) মালসী (২) ডাক মালসী (৩) লহর মালসী এবং (৪) মায়ুর মালসী। মালসী বলতে দেবীবিষয়ক গান। ডাক মালসীতে মালসীর ভাব এর আয়তন বড়, এবং এর ভেতর নানা বৈচিত্র আছে, লহর মানে লড়াই অর্থাৎ লড়াই-এর জন্য যে মালসীগান রচনা হয় যেমন 'কবিগানের লহর' বা 'কবির লহর' এবং মায়ুর বলতে শিব বিষয়ক গান অর্থাৎ চড়ক পূজায় মায়ুর মালসী গান গাওয়া হয়। মালসী গান দীর্ঘকাল ধরে মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি চলে এসেছে।

দেবীবিষয়ক গান রচয়িতাদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে প্রথম স্মরণ করতে হয়। শক্তি সাধক রূপে রামপ্রসাদ সকল বাঙালীর হৃদয়ে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রচিত দেবীবিষয়ক গানগুলি লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। এগুলি যেমন সরল তেমন মর্মস্পর্শী। তিনি বিশ্বমাতা মা কালীকে কন্যারূপে দেখেছিলেন। তাঁর ঘরের বেড়া মা কন্যারূপে এসে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর গানে সহজ সরল ভঙ্গীতে মাকে অনুযোগ অভিযোগ শুনতে হয়েছে। তিনি বলেছিলেন 'মা আর ঘুরাবি কত চোখ বাঁধা বলদের মত'। আবার মাকে অনুযোগের সুরে বলছেন—

দুখ কই গো পাষাণের মায়্যা মনের দুখ তোমারে কই
দারুন পেটের জ্বালায় পরের বোঝা মাথায় বই
……কোন কোন দিন উপবাসী রই
আমরা কি তোমার পাকা ধানে দিয়েছিলাম মই
কারে দিলে রাজ-দেয়ানি তার সুখের সীমা নাই ?
তারা কি তোমার বাপের ঠাকুর আমরা কি কেউ নই।

পুত্র সুপুত্র আমি যে হই সে হই
জন্মাবধি মোর কপালে লিখ নাই দুখ বই
প্রসাদ বলে গুরুর বলে শুন ব্রহ্মময়ী
এ ভবেতে কবার এলাম কবার গেলাম এই তোরে কই।

তিনি মাকালীকে ভৎসনার সুরে গেয়ে বলেছেন কেন তিনি দেবাদিদেব মহেশ্বরের বুকে পা দিয়েছেন। তাই তাঁর একটি গানে দেখতে পাই—

এলোকেশী সর্ব্বনাশী দেখ চক্ষে চেআ
হর হৃদে পদ দিয়ে আছ গো দাঁড়ায়্যা।
যার লেগ্যা শতবার আপুনি হল্যা সংহার
তার নাকি এ দুর্গতি কর্য্যাছ গো খেপা মেয়্যা ?
দেখিয়া তোমার কাজ রামপ্রসাদ পেআছে লাজ
চরণতলে ত্রিপুরারি আছে চরণ ধিয়াইয়া।

রামপ্রসাদের পর সাধকরঞ্জন কমলাকান্ত ভাট্টচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কমলাকান্ত দেবীবিষয়ক বহু গান রচনা করে গেছেন। তাঁর গানের একটি উদাহরণ দেখান হল।

বল মা তারা কি গতি আমার
অবনী আসিয়া দারা সুত পায়্যা
ভুলিলাম পঙ্কজ চরণ তোমার।
ভজিব বলিয়া হরষিত হয়্যা
জনম লভিলাম কত শতবার
মম ভাগ্য মন্দ তব পদ দ্বন্দ্ব
ভুলিলাম ভুলিলাম আমি বারেবার।
ভাবি মনে মনে ভয়াকুল প্রাণে
শমন সরণি কে করিবে পার
ভাব্যা আছি মনে নিদানে মা বিনে
কে তরাবে আর কারে দিব ভার।
না ভজি তোমারে মূঢ় জন করে
দারা সুত ধন সকলি তোমার
আয়ুশেষ হল্যে দু আঁখি মুদিলে
সে সুখ সম্পদ কোথা থাকে কার।
রাজা তেজচন্দ্রে রাখ্য আনন্দে

চন্দ্রকোণা পুরী যার অধিকার
আমি অতি দীন ভজনে বিহীন
যুগল ব্রাহ্মণ অতি কদাচার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মালসী গান রচয়িতার নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে রামবসুর নাম সর্বজন বিদিত। তিনি মালসী ও সখী সংবাদ গান রচনা করে এবং মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে বাঙ্গালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। রামবসুর কয়েকটি গানের মধ্যে আগমনী গানে যে বাৎসল্য রস ফুটে উঠেছে তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি গানের মধ্যে দিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে বাৎসল্যপ্রেমে মায়ের মনকে উদ্বেলিত করেছে। তাঁর মালসী গান উমার কৈলাস থেকে আগমন এবং প্রত্যাগমন পর্যন্ত যে বর্ণনা আছে তাহা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমন হৃদয়বিদারক বটে। রামবসুর আগমনী থেকে বিজয়া পর্যন্ত যে বর্ণনা আছে তা আর বাংলার কোন কবির গানে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মাতা মেনকা গিরিরাজকে কৈলাস থেকে উমাকে নিয়ে আসবার জন্য বারবার অনুরোধ করছেন। এ যেন ঠিক গৃহস্থ ঘরের মায়েদের আবদার। জামাই শিবের জন্য আক্ষেপ তার মেয়ের দরিদ্র্য দুর্দশার জন্য মনক্ষুণ্ণতা তারপর মেয়ে এলে মায়ের মনে আনন্দ এবং মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাবার দিন চোখ ফেটে জল, বুক ভরা কান্না আর ভয়ের আশঙ্কায় মাকে কতখানি পীড়িত করেছিল রামবসু এর চিত্র এঁকেছেন তাঁর নিম্নক্ত মালসী গানে। কবি আগমনী বর্ণনা করতে গিয়ে গেয়েছেন ঃ—

গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি সুস্বপন
এল হে সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে মা কই, মা কই,
মা কই আমার, দেও দেখা দুখিনীরে
আমি দু'বাহু পসারি
উমা কোলে করি
আনন্দেতে যেন আমি নই।
ওহে গিরি গা তোল হে
উমা এলেন হিমালয়।
জয় দুর্গা দুর্গা বলে
দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়।।

কন্যা-পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়
আঁচল ধ'রে তারা বলে, বলেছি মা কি মা,
মা গো, ওমা বাপের কি এমন ধারা।
গিরি তুমি যে অগতি
বুঝে না পার্ব্বতী
প্রসূতির অখ্যাতি জগৎময় ।।
মা হওয়ার যত জ্বালা
যাদের মা বলবার আছে, তারাই জানে
তিলেক না হারিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই
কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহ টানে।
তোমাকে কেউ কিছু বলবে না
দেখে দারুণ পাষাণ,
আমার লোক গল্পনায় যায় প্রাণ।
তোমার ত নাই স্নেহ,
একবার ধর কোলে কর
পবিত্র হ'ক পাষাণ দেহ
আহা এত সাধের মেয়ে,
আমার মাথা খেয়ে
তিন দিন বই রাখেন না মৃত্যুঞ্জয়।

স্বল্প তিনদিন মেয়ে বাপের বাড়ী এসেছেন তাতে মা আনন্দে কি রকম উৎফুল্ল হয়ে পড়েছেন আর মেয়ের পিতাকে কত কথায় তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তার পরিচয় দিয়েছেন রামবসু এই আগমনীর মালসী গানে। তিনি আবার মেয়ের মুখ দিয়ে তাঁর বাবামায়ের প্রতি আকুলতা ফুটিয়ে তুলেছেন—

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে
গিরিরাজ! ওহে শুন, শুন তোমার মেয়ে কি বলে
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে
এলে বলতে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব শুনেছে
তোমায় দেখতে পাষাণী
আপনি ঈশানী আসতে চেয়েছে।
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,

আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ।। ইত্যাদি

নবমী আসলে মা মেনকার প্রাণ যেন আকুল হয়ে ওঠে তখন তিনি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সংসারের কাজ আর কিছুই করতে চান না, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। তাই নবমীর গানে দেখতে পাই—

মেনকা কয় হে শুন ওহে গিরিরাজন
এই রজনী গেলে প্রভাতকালে
কাল সকালে আসবেন ত্রিলোচন
তবে লয়ে যাবে উমাসনে
সেই কৈলাস ভবনে।

আর দশমীর দিন স্নেহ বাঁধ ভাঙ্গা বাপের হৃদয় গুমরে ওঠে চাপা কান্নায়—

হোল নবমী যামিনী গত দশমী উদয়
গিরিবর হয়ে সকাতর অভয়ারে কয়
আমার মা তুমি গো ত্রিপুরেশ্বরী
তব পিতা আমি গৌরী
কৃপা করি ডাক পিতা বলে। ইত্যাদি

অনেক দাঁড়া-কবি মালসীকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন যেমন 'লহর মালসী' এবং 'ডাক মালসী', দাঁড়া কবিগণ দাঁড়িয়ে কবিগান গাইতেন। তাঁরা প্রথমে দেবী বন্দনা করে গান শুরু করতেন। লহর মালসী ডাক মালসীর রূপান্তর আকারে সংক্ষিপ্ত বানাতিদীর্ঘ। হরু ঠাকুর মালসী গান আগমনী, সপ্তমী, নবমী ও দশমী এর চার পর্যায়ে ভাগ করে রচনা করেছিলেন। তাঁর গানগুলি খুবই হৃদয় মনোহরকারী। তাঁর গান থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিলাম—

ওগো তারা, আয় মা দুখ পাসরি
বল দেখি 'মা' আমারে
কন্যে দিয়ে দৈত্যের ঘরে
সদাই ভাবতেম তোমার তরে
দুঃখে মন পোড়ে।
জামাই ভিক্ষে করে খায়,
শ্মশানে বেড়ায়
কোথা ছিলে তুমি ভিখারীর ঘরে। ইত্যাদি

হরু ঠাকুর দেবীপূজার সপ্তমীর দিন গেয়ে উঠলেন—

শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে
উমা এলেন হিমালয়। ইত্যাদি

এই গানগুলি মহড়া, খাদ, ফুকা, মেলতা, চিতেন, পাড়ন এবং অন্তরা প্রভৃতি দমকে গাওয়া হত।

এক সময় মালসী গানে স্ত্রী গায়িকাদের বিশেষ আধিপত্য ছিল। তৎকালীন যজ্ঞেশ্বরী, তারিণী ব্রাহ্মণীর খুব নাম ডাক শোনা যায়। এখানে ব্রাহ্মণীর গানের দুটি লাইন উদ্ধৃত করলাম—

শিব দুর্গা নাম লওনা কেন মন রে আমার
অন্তিম কালে তরাইতে ভব নদী পার। ইত্যাদি

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আখড়াই গানের ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলাদেশের নবলব্ধধন বিকৃতরুচি নাগরিক সংস্কৃতি যখন কলকাতাতে শিকড় গাড়িয়া তখন খেউড় এই কবিগানের প্রধান কেন্দ্র হইল এই ইংরেজ রাজধানী, বাঙ্গলাদেশে ইংরেজ শাসন। সুদৃঢ় করিতে যে বাঙালীর দায়িত্ব সর্বাধিক এবং যিনি ইংরেজ শাসনকর্তার অনুগ্রহলব্ধ মান ঐশ্বর্যের নবগরিমায় মুর্শিদাবাদের রাজসভায় দ্রুতম্লানায়মান ঔজ্জ্বল্যের ব্যর্থ অনুকরণে অগ্রসর ছিলেন সেই 'মহারাজা বাহাদুর নবকৃষ্ণদেব' এই ধরনের ও অন্যাবিধ বৈঠকি গানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার মধ্যে এক-জনের—কলুইচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় কবিগান পাঁচালী-কীর্ত্তনের ঢঙ ছাড়িয়া ওস্তাদি ছাঁচে ঢালাই হইয়া 'আখড়াই' (অর্থাৎ আখড়া বা সঙ্গীত পাল্লার উপযুক্ত) নামে রূপান্তরিত হইল।

আখড়াই গানের রচনা সংক্ষিপ্ত ও সারবন্ধ। তিনটি মাত্র গানে গাওনা শেষ হইত। প্রথমে মালসী অর্থাৎ ভবাণীবিষয়ক, তাহার পর প্রণয়গীতি (সাধারণত মিলনের আর্ত্তিসূচক) শেষে প্রভাতী (রজনী প্রভাতে মিলনের সম্ভাবনা দূর হওয়াতে আক্ষেপ) ইহাতে ধ্রুপদ খেয়ালের মত রাগের আলাপ ও সুরের বৈচিত্র্য দীর্ঘ বিলম্বিত হইত। আখড়াই নাম সেই জন্যই। বাজনা ও সঙ্গতে বিশেষ পরিপাট্য ছিল। আখড়াই গানে বাজনার দ্রুততা (Tempo) ছিল প্রধান চারি-প্রকার পিড়ে (বা পিঁড়ে) বন্দী (overture), দোলন (swing), সব দৌড় (full tempo) এবং মোড় (climax) কবি গানের মত আখড়াই-গাওনায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর হইত না, যে দল গান-বাজনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইত তাহারই জয়।"

তৎকালীন কলকাতায় মালসী গান খুবই জনপ্রিয় ছিল এই আখরাই গান থেকে বোঝা যায়। বাগবাজার, শোভাবাজারের ধনী ব্যক্তিরা এবং পাতুরিয়া ঘাটার নীলমণি মল্লিক ও তাঁর বন্ধুবর্গ এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। কলুইচন্দ্র সেনের পুত্র গোকুলচন্দ্র সেন, শ্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানীবিষয়ক গান ও সুর দিয়ে কলকাতাবাসীকে তন্ময় করে দিয়েছিলেন।

বাংলার লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য

বাংলার লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। ইহা বাঙালীর ঘরের কথা প্রকাশ করেছে। সাহিত্য সহিত-ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়ে, তার আপন যোগ্যকে, বোধগম্য থেকে অবোধগম্য ভাব ও ভাষার সংগে যুক্ত করে মানুষের অন্তরের কথা প্রকাশ করে। মানুষের চিন্তার কঠিন থেকে কঠিনতর পর্যায় সাহিত্য ছারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রতিদিন প্রতিটি মানুষের চিন্তাধারা যে কত ভাবে তাদের বক্তব্য বাক্য বিন্যাশে প্রকাশ করছে সে সকল এক সংগে টুকে রাখা সম্ভবপর নয়। সেজন্য মানব সমাজ তাদের চিন্তাধারার অংশগুলিকে কতকগুলি স্তরে ভাগ করে প্রতিটি সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। যে সকল চিন্তাধারা কার্যকরী বা ফলপ্রসূ ও উচ্চস্তরের অর্থাৎ সামঞ্জস্যহীন নয় এবং যাকে সৌন্ধবযুক্ত আকারে লিখিতে পারা যায় তাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই উচ্চশ্রেণী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তদের ছাড়া আর একটি অপূর্ব কাব্যময় উচ্চশ্রেণী সাহিত্য আছে তা হল লোকসাহিত্য। উচ্চশ্রেণীর ভাবুকদের জন্যই অক্লান্ত পরিশ্রম করে পূর্বকাল থেকে গ্রামবাসীগণ এ সাহিত্য গড়ে তুলেছে কিন্তু তা এই উচ্চশ্রেণী ব্যক্তিরা সব সময়ে বড় খেয়াল করেন না। তার ফলে আমাদের দেশের এই গ্রামবাসীদের সাহিত্য আশানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করছে না। অনেক সময় দেখা যায় কঠিন রোগীকে বিলাত ফেরৎ উচ্চ উপাধি যুক্ত ডাক্তার বা ধন্বন্তরী কবিরাজও শতচিকিৎসা করেও ভাল করতে পারে না কিন্তু একটি অমূল্য গ্রাম্য ঔষধে সে রুগ্ন ব্যক্তি আশ্চর্য আরোগ্য হয়ে যায়। সেরকম আমাদের মধ্যে কেবল উচ্চশ্রেণী সাহিত্য আলোচনা সবসময়েই সম্পূর্ণ চিত্তবিনোদন করতে পারে না তখন এরকম সহজ সাহিত্যের প্রয়োজন হয়। অনেকে মনে করেন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে যে স্থানটি খুব জটিল নয়, যাহা সাধারণের বুঝবার উপযোগী সেরকম একটি সাহিত্য বাছাই করে নিলে তাঁদের পূর্বকথিত ক্লান্তি হয়ত কমে যাবে কিন্তু তা হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষকমণ্ডলী ভুল করে নানা জটিল শিক্ষা দান করেন। কিন্তু তাতে হৃদয় বিনোদনের কোন সম্পদ নেই। তাতে মানবের জীর্ণ দেহকে সাংসারিক চিন্তার ক্লেশে জর্জরিত করার ন্যায়ই অবসন্ন করে দেয়। মানুষ চায় আনন্দ তার মানে এই

নয় খুব বাজনার সঙ্গে নাচ গান ও আলোর উজ্জ্বলতা। তার মধ্যে যদি কোন রস বস্তু না থাকে তাহলেও তার কোন দাম নেই। মনবের চিত্ত রসবস্তু দ্বারা আকর্ষণ করতে পারে একমাত্র লোকসাহিত্য।

বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের যেমন কোমলতা, ভাবপ্রবণতা, হাঁসির ঝঙ্কার এবং চিত্তকর্ষতা তেমন অন্যদেশের লোকসাহিত্যে নেই। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য থেকে লোকসাহিত্যের তফাৎ এই যে মানবের মনে সাধারণ সম্পদ যা জমা আছে তা লিখিত এবং মৌখিক সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার চেয়ে, জীবনের ব্যস্ততার সুপরিসর কার্যক্ষেত্রটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে মানবের জীবনকে কি করে আনন্দদান করতে হয় তার নির্দেশ আছে। এই সাহিত্যের মধ্যে সমস্ত প্রকার রস আছে। কখনও কখনও ইহা শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি উচ্চস্তরের সাহিত্য প্রচার করে। লোকসাহিত্য তিনটি ভাগে বিভক্ত যেমন লোকসঙ্গীত, লোকযান অর্থাৎ ফোকলোর (যার মধ্যে কথা, প্রবাদ) হেঁয়ালী, নৃত্য প্রভৃতি, এবং লোক-শিল্পকলা। এ সকল কেবল চিন্তাশীল জনগনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা নয়, এ উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের আনন্দদান করত এবং তাঁদের সাহিত্যের উপাদান যোগাত। এগুলি ক্রমশঃ উচ্চ ও নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচারিত হলে তখন আর উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা আত্মপ্রকাশ না করে থাকতে পারলেন না। উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর বলে যাকে ভাগ করা হয় তাদের সকলের বাস একই গ্রামে পাশাপাশি। যাদের রসবোধ আছে, যত বড়ই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যে সাম্যবাদ ব্যতীত কেহই সত্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেনি। ভারতের উচ্চস্তরের সাহিত্য বলতে সংস্কৃত ও পালিকে বুঝি। এ দুটি উচ্চসাহিত্যে কোন কোন লোক-সাহিত্যে প্রভাব নেই কি? পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, জাতক, কথাসরিৎসাগর এমনকি অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বেদকেও চাষার গান বলেন। এইসব সাহিত্য থেকে মানবের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং জীবনের চলার পথে এগুলি পাথেয় স্বরূপ। এ আবাল বৃদ্ধ বনিতার সযত্নে পাঠ্য। সকলেই মনে করে এতে আমরা উচ্চতর সাহিত্য পাঠ করছি। এদের কোন কোন অংশ কি লোকসাহিত্যের চরম বিকাশ নয়? আমাদের দেশের অনেকের ধারণা ইউরোপীয় গল্পগুলিতে খুব সাহসিকতা আছে; তাহা কি আমাদের গল্পেতে নেই? এ ভুল কথা; আমাদের দেশে বাংলা গল্পগুলিতে এমন এমন অদ্ভুত ঘটনাবলী আছে যা পৃথিবীতে অন্য কোন লোকসাহিত্যে নেই। এখনও পর্যন্ত ইউরোপীয় বিদ্বৎ-মণ্ডলী বলেন, মধ্য শতাব্দীতে বহুবিধ গল্প ভারত থেকে ইউরোপে এসেছে। হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের বহু গল্পগুলি (Tables) আরবীয় ভাষায় অনূদিত

হলে তখন ইউরোপবাসী তা নিজ সাহিত্যে গ্রহণ করে। ডঃ ম্যাকডোনাল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন, ইউরোপ মধ্যযুগে ভারতের গল্প ও রূপকথার কাছে ঋণী। ভারতের মধ্যে বাংলা গল্প, গান, কথা প্রভৃতি সাহিত্যের অফুরন্ত ভান্ডার।

বাংলার লোকযান অর্থাৎ ফোকলোর তৈরী হত গ্রাম্য লোকের মুখে মুখে। গ্রাম্য বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা এই সকল গল্প কত রোমাঞ্চকর করে বলত তাহা ১৬শ শতাব্দীর আগে কেউ টুকে রাখেনি। ফকিররাম কবিভূষণ নামে একজন সাহিত্যিক এর মূল্য বুঝে যত্নপূর্বক সংগ্রহ করতে লাগলেন। তারপর রেভারেন্ড লালবিহারী দে তাঁর Folk tales of Bengal নামে ইংরাজী গ্রন্থের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মন্ডলীর মধ্যে এক জাগরণ এনেছিলেন। আমাদের বাংলার রামায়ণ ও মহাভারতে অনেক গল্প লোকযান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ সকল গল্পে কোন ঐতিহাসিকতা নেহ। বাংলার লোকসাহিত্য এশিয়ার কোন দেশের গল্পের আগাছা না হয়ে নিজে মহাবৃক্ষ হয়ে নিজের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করেছে। বাংলার 'ফকীরচাঁদ' 'বিহঙ্গম বিহঙ্গমী' আর অন্য কোন ভাষার সাহিত্যে নেই। বাংলার লোকযানের মধ্যে বিশেষত্ব এই, প্রত্যেক গল্পে মস্তপুতে পাখী বা কোন জন্তু মানুষের সঙ্গে খেলা করছে। বাংলার গ্রাম্য সামাজিক চিত্রেরও কোন অভাব নেই। সখীসোনা, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা প্রভৃতি গল্প আজও প্রত্যেক বাঙালীর মুখে শোনা যায়। বাংলায় ঐতিহাসিক গল্পও প্রচুর আছে। মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি খৃষ্টীয় এগার বা বার শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল। লালবিহারী দের পরে লোকসাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কলমের যাদুতে যে রূপ ধরা পড়েছিল, তাই আজ বাংলা লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য প্রচার করছে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন 'দক্ষিণাবাবুর ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের ভেতর কোন বৈদেশিক ছায়া নেই এ আমাদের একেবারে খাঁটি দেশী সাহিত্য ও ভাষা এবং বাংলার প্রাচীন Dialect কি ছিল তাই প্রমাণ করে দিচ্ছে।' প্রাচীন বাংলা একটি বিরাট বাণিজ্যক্ষেত্র ছিল, এ স্থান থেকে কে বলতে পারে আমাদের লোকসাহিত্য বিদেশে প্রচারিত হয়নি? শঙ্খমালা, পুষ্পমালা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি গল্পকে পৃথিবীর যে কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। এ সকল গল্পের মধ্যে এতই উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারার সমাবেশ হয়েছে যে এ যে কোন জাতির সাহিত্য হলে তাঁরা গর্ববোধ করতেন। ফোকলোর, ফোকটেলস বা ফেবলস

বলতে আজগুবি কথা বলে কারও কারও মনে হয়, কিন্তু বাংলার এ সকল গল্পের ভেতর মার্জিত রুচি, প্রেম, সাহস এবং সংসার ধর্মের যে নিখুঁত ছবি আছে তা পৃথিবীর কোন লোকসাহিত্যে নেই।

আমরা ফোকলোরকে এখনও কেউ কেউ শিশুসাহিত্য বলে মনে করি। এ যে গ্রাম্য সংসার বাহিনীর ভেতরকার কত উচ্চকথার প্রচার করছে তা শিশু-পাঠ্য তো নয়ই, শিশুদের পিতা-পিতামহদেরও যে কত গৌরবের এ কথা আমরা ভুলে যাই।

মগধ, গৌর, মৌর্য্য, সুঙ্গ, গুপ্ত এবং পাল রাজাদের সভায় এই লোক-সাহিত্য খুব উচ্চস্থান অধিকার করেছিল। যখন মগধের অস্তিত্ব রইল না, সেই রাজ্যের প্রজারা গৌড়ে আসতে আরম্ভ করল। পাল রাজারা বিদ্যার প্রতি যত্ন দেখাতে লাগলেন। পালরাজাদের সময়ই মনসাদেবীর গান সারা গৌড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। লোকসাহিত্যের যেমন ভাগ আছে সেরকম লোকযান বা ফোকলোরের স্বতন্ত্র ভাগ আছে। এর দুটি বিভাগ হচ্ছে শিশুসাহিত্য ও উচ্চভাবমূলক সাহিত্য। এ দুটি সাহিত্যকে একই শিশু-সাহিত্য পর্যায়ে ফেললে অত্যন্ত ভুল করা হবে। উচ্চ দর্শন সাহিত্য আমরা পড়ি এবং তা থেকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করি। কিন্তু সহজ সাহিত্যের মধ্যে কালকেতু, ফুল্লরা প্রভৃতি চরিত্রে তাদের শিক্ষা না থাকলেও, ভক্তির সরল কথা সেখানে অপূর্বভাবে শুনতে পাই। মধুমালা এবং মালঞ্চমালা গল্পে চারটি বেদ এবং আটটি পুরাণের কথা পাই এবং এই সকল গল্পের মধ্যেই বাংলার অসাধারণ রূপ ফুটে উঠেছে। তখনকার দিনে মানুষ কি ভাবে বাস করত এবং তৎকালীন বহু দেবদেবীর নাম এতে পাওয়া যায়। সে সময়ের নারীদের নাম কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, মণিমালা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম এবং তাদের চরিত্রের ভেতর দেবীর আসল মূর্তি দেখা যেত। তখনকার দিনে লক্ষ্মীশ্রী ছিল, প্রত্যেকের স্বামীপুত্র বাণিজ্য করত, বাংলার ঘরে ঘরে ভগবানের অশেষবিধ আশীর্বাদ ছিল। এখন যেমন লোকের পরিচয় দিতে হলে বড়লোক, গৃহস্থ প্রভৃতি বলে অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তখনকার দিনে 'আয়বেনে' 'সায়বেনে' 'গন্তবেনে' এবং 'মস্তবেনে' বলে পরিচয় দেওয়া হত। এ সকল বণিকদের গল্প কত রোমাঞ্চকর এবং উন্নত ভাবময় তা না পড়লে কেউ ধারণা করতে পারবেন না।

সেই সময়ের অন্তঃপুরিকারা গল্প তৈরী করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন আর পুরুষরা ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজের দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতেন। তাঁদের

মুখে মুখে কত ছড়া, কাহিনী ও চরিত্রের সৃষ্টি হত। তা এত চমৎকার হত যে বারংবার বলেও তৃপ্তি হত না। মেয়েদের ব্রতকথা লোকসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। তার মধ্যে কত শত গল্প রচিত হয়েছে তার শেষ নেই। কুমারী থেকে বৃদ্ধারা নানা শুভ নিষ্ঠাচারের মধ্যে নানা গল্পের বিন্যাসে ও গানের ছন্দে জীবনের কত সম্পদ যে সাহিত্যের মন্দিরে তৈরী করেছেন তার অবধি নেই।

আট থেকে দশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় চার রকমের লোক-কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল যেমন রূপকথা, রসকথা, ব্রতকথা আর গীতকথা। রূপকথা অর্থাৎ পরীর, দৈত্যদানবের গল্প, রসকথা অর্থাৎ হাস্যকৌতুক যেমন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী এর ভেতর থেকে আনন্দ ও নীতিজ্ঞান পাওয়া যায়, ব্রতকথা হল কুমারী থেকে বয়স্কা মেয়েদের আচার অনুষ্ঠান এবং আলপনার ভেতর দিয়ে নিজেদের ভক্তির প্রকাশ, গীতকথা কেবল সাধারণ গ্রাম্য গীত নয় এর ভেতর দিয়ে বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তু আছে যা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার তাঁর 'ব্রতকথা', 'বঙ্গোপন্যাস' ও 'ঠাকুরমার ঝুলি'-গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এর পরিচয় ময়মনসিং গীতিকায় পাওয়া যায়।

আজ পর্যন্ত ফোকলোর যা উদ্ধার হয়েছে এবং যার গবেষণা এখনও চলছে, দুঃখের বিষয় তার কতক কোন কোন বিশেষ অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও অনেকে ভাল করে এর পাতা উলটিয়ে দেখেন নি। বেশীর ভাগ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এ সকল সাহিত্যকে সময় অপনোদনের খোরাক হিসাবে মনে করেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের এই অমনোযোগহেতু তার প্রকৃত মূল্য ও স্থান ক্রমশঃ নষ্ট হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় বলেছেন 'For a scientific study of our folklore it is, in the first place, essential that before this process of degradation, decay, transformation, and deterioration procuds further and plays havoc among much of our existing folklore no time should be to secure as accurate and complete records as possible of such folklore material as are still extant.' আমাদের ভারতে যত রকমের লোককথা চলিত আছে তার তুলনায় বাংলার লোককথাগুলিতে উচ্চ স্তরের শিক্ষা ও আনন্দ প্রদানকারী বহু উপাদান আছে। বাংলার লোককথাও ভাষায় তৈরী, তার শব্দ চয়ণ করলে দেখা যাবে এ বাংলা ভাষার নব নব হীরক মাণিক্যে বা কথার সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে আছে। এগুলি এত শ্রুতিমধুর

যেমন 'নিগম নিশুতিরাতি' 'নিতি আঁধার পুরি' প্রভৃতি কথায় নানা প্রকার ভঙ্গিমা কোন সাহিত্যে নেই।

তাই ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন Folk literature of Bengal এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এ দুটি গ্রন্থে এর বিশদ আলোচনা করেছেন। বাংলার লোককথার যেমন নানা দিক আছে তেমন লোকসংগীতের বহু রকম নাম ও তার নানা রকম সুর আছে। যেমন

(১) পটুয়া সঙ্গীত—১৯৩৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস লিখিত পটুয়া সঙ্গীত প্রকাশ করে বিম্বদ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গুরুসদয় দত্ত তাঁর পুস্তকের পরিচায়িকায় লিখেছেন বাংলাদেশে আজকাল পটুয়া শিল্পের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে উহা বাংলার গণ-সংগীত, গণ-নৃত্য ও গণ শিল্পের প্রতি অনুরাগের ইতিহাসেরই একটি অঙ্গস্বরূপ, তিনি আরও বলেছেন বিশেষ করিয়া এই পটুয়াগণ পট-চিত্র-অঙ্কণ ছাড়াও যে কাব্য রচনা করিয়া সেগুলি গাহিয়া চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং সেই কাব্যগুলি যে সাহিত্য হিসাবে সবিশেষ মূল্য আছে তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সমাজ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

(২) ভাটগান—ভাটগান শিলেটের প্রত্যেক ঘরে ঘরে গীত হয়। যখন বাংলার জমিদারেরা আমোদ প্রমোদে নিজ বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করতেন তখন ভাট কবিরা গান গেয়ে তাঁদেরকে সচেতন করতে চেষ্টা করতেন। এ ঠিক রাজপুতানার চারণ কবিদের মত তাঁরা যেমন রাজকাহিনী গেয়ে বেড়াতেন।

(৩) কীর্তন—কীর্তন উচ্চমার্গের ওলোকসংগীতের অমূল্য সম্পদ। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এর নতুন ভাব ও ভক্তির অপূর্ব সমাবেশ দেখা দেয়।

(৪) ধামালি—শ্রীহট্ট স্ত্রীলোকদের দ্বারা গীত হয়।

(৫) সারি— সারিগান মনসাপূজা বা দুর্গাপূজা উপলক্ষে যুবকদের দ্বারা বাইচ খেলার সময় গীত হয়, যেমন সারি গেয়ে দাঁড়ীগণ বেয়ে যায় তরী।

(৬) ঘাটুগান—ঘাটুগান মৈমনসিংহ জেলার এক প্রকার গ্রাম্যগান। মৈমনসিংহ জেলার গাথা জাতীয় গান।

(৭) জারীগান—জারীগান বাংলার মুসলমানদের চির প্রিয় করুণাত্মক গান। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন তীব্রভাবে অন্য কোন পল্লীগানে ধ্বনিত হয়নি। যেমন 'জহর গুলে আনরে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।'

(৮) কবিগান—কবিরদল একদিকে সমাজ সেবক অন্যদিকে ইতিহাসের বক্তা। কবিরদলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অংগ। ইংরেজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করে পৌর জনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করেছে এই গানগুলি তারই পথ প্রদর্শক।

(৯) ভাটিয়ালী মাঝিদের গান

(১০) বারমাসী

(১১) বাউল

(১২) ধুয়াগান

লোকসঙ্গীতগুলি বাংলার রক্ত প্রবাহের মত লোকসাহিত্যের ধমনীতে প্রবাহমান। বর্তমানে এই লোকসংগীতের আদর শিক্ষিত সমাজে দেখা দিয়েছে। যদি তাঁরা ঐ সকল গানগুলি হুবাহু রেকর্ডে নকল করে সেই সুরে গান গাওয়ান তাহলে গানগুলি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বাংলার লোকসংগীতের একটি অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি আছে। বাংলার গ্রাম্য-সাহিত্য ধর্মের মধ্য থেকে উঠেছিল। গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির এবং গ্রামের স্মৃতির আলেখ্য রাখে। সেজন্য বাঙালীর কাছে এটি রসঘন বলে মনে হয়। বৈষ্ণবী যখন 'জয়রাধে' বলে ভিক্ষা করতে অন্তঃপুরের আঙিনায় এসে দাঁড়ায় তখন কৌতুহলী গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিতা বধূগণ তা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে আসেন। প্রবীনা পিতমহী গল্পে, গানে, ছড়ায় যিনি আকন্ঠ পরিপূর্ণা, কত শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নায় ও কৃষ্ণপক্ষের তারার আলোকে তাঁকে উত্যক্ত করে তুলে গৃহের বালিকা, যুবক যুবতী একাগ্রমনে বহু শত বৎসর ধরে যা শুনে আসছে, বাঙালী পাঠকের কছে তা রসাত্মক এবং অক্ষয়।

মানবের মনে কত নব নব ভাব প্রতিদিন বিকাশ লাভ করছে তা বলা যায় না। যে সকল ছবি তাদের মনে আছে ও সাহিত্যের রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে

এবং মিলিয়ে যাচ্ছে, তা শিক্ষিত জন মন্ডলী গ্রাহ্য করে না। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকের বাস গ্রামে। যারা অশিক্ষা ও অভাবে শীর্ণ হয়ে বেঁচে যাচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের লক্ষ নেই। এখন যে সকল ছড়া, গল্প, গান কথা ও কাহিনী মুখে মুখে বলে আসছে তাও আমাদের শিক্ষিত নারীরা বড় একটা তাঁদের কাছে সমাদর পায়না। বর্তমানে পাশ্চাত্য সংমাকে আপনার করে নিজের মা ত্যাগ করেছেন। যে বাংলা ভাষার গাঁথুনীতে বঙ্কিমচন্দ্র, আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, দক্ষিনারঞ্জন, দীনেশচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে হীরামুক্তা সংগ্রহ অট্টালিকা তৈরী করেছেন তাহা কি বাঙালি জীবিত থাকতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে? মানুষের আত্মচেতনা এবং আত্মমর্যাদা এখন দিন দিন হীন হয়ে গেছে তারই ফলে লোকসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ পূর্বের মত আর নেই। আমাদের প্রাচীন মঙ্গলকাব্য ও প্রকৃত বাংলাসাহিত্য বুঝতে হলে এই লোকসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ পেতে হলে লোকসাহিত্যের ভেতর খুঁজতে হবে তবেই বাঙালীর ও বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। আমাদের লোকসাহিত্যের জাতীয় সম্পদের আমি একটি লোক সংগীতের কয়েকটি লাইন উধৃত করে উপসংহার করছি।

এ মেঘ আন্ধার রাত্রি
কেহ নাহি সাথে রে কালা
তুমি একেলা আসিয়াছ রে বন্ধু।

লোকসাহিত্য সংগ্রহ করতে বহু দুঃখ ক্লেশ সহ্য করতে হবে। তাই আর একটি লাইনে আছে—

তুমি ধীরে ধীরে বাড়াইয়ো
পাও।

বাংলার বর্ষায় গ্রাম্য ছড়া ও হেঁয়ালী

বাংলা নদীপ্লাবিত দেশ হলেও চৈত্র থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত এক ফোঁটা জলের অভাবে নদী, নালা ও সকল জলাশয়ই শুকিয়ে যায়। তখন এক ফোঁটা জলের জন্য জীব, জন্তু ও মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জলের অভাবে নানারকম রোগের প্রকোপে দেশে মরক ও মহামারীর উৎপত্তি হয়। আকাশে চাতক 'জলের জন্য ছাতি ফাটে' বলে চীৎকার করে উড়তে থাকে। পুকুর, নদী ও খালের পাশে বেঙেরা 'কটর কটর' শব্দ করে জল যাচ্ঞা করে। শিশুরাও 'আয় বৃষ্টি ঝেপে ধান দেব মেপে' বলে চীৎকার করে বৃষ্টিকে আহ্বান করতে থাকে। কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ে বর্ষার কবিতা উপভোগ না করতে পারলেও মানবের অন্তরের আহ্বানে বর্ষার স্পন্দন এই সকল গ্রাম্য ছড়া ও হেয়ালীর ভেতর থেকে পাওয়া যায়। বাংলার এ সকল ছড়াগুলি ঠিক মন্ত্রের মত মর্তে বর্ষাকে ডেকে আনে। শিশুহৃদয়ে কোন মলিনতা থাকে না বলেই হয়ত তাদের এই গান 'মেঘমল্লারের' মত ধ্বনিত হয়। এখানে শিশুদের এরকম কয়েকটি ছড়ার উদাহর দেওয়া হল :—

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
ধানের মা বুড়ি, কাঠকুড়াতে গেলি
ছ খানা কাপড় পেলি
ছ বউকে দিলি
আপনি মরিস্ জাড়ে
কলাগাছের আড়ে
কলা পড়ে টুপটাপ
বুড়ি খায় গুপগাপ ইত্যাদি

এ ছড়াগুলির একটি পদের সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ না থাকলেও কোন স্থানে শ্রুতিকটু হয়নি। বৃষ্টিকে আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির চিত্রকে ফুটিয়ে তোলার যে বৈশিষ্ট এ ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভবপর হবে না। বৃষ্টিকে ডাকতে ডাকতে বৃষ্টি এসে পড়ল, তখন ছেলেমেয়েরা আদ গলায় গান আরম্ভ করল—

বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল
তিন কন্যা দান
একটি কন্যা রাঁধেন বাড়েন
একটি কন্যা খান
একটি কন্যা গোঁসাভরে
বাপের বাড়ী যান। ইত্যাদি

এ ছড়াটির সঙ্গে পুরাণের কিছু মিল দেখা যায়। শিবঠাকুর গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি গঙ্গার ওপর অতিরিক্ত অনুগত বলে সরস্বতী রেগে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। এ ছড়াটির মধ্যে বানের কথা দেখতে পাই। বাংলা নদীমাতৃক দেশ, এখানে বাণ হওয়া খুব অসম্ভব নয়। প্রত্যেক বছর বর্ষার জলে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের যে ক্ষতি হয় তা কাউকে নতুন করে বলতে হবে না। পশ্চিমবাংলায় অনেক কবি বানের ছড়া এবং কবিতা রচনা করেছিলেন। দামোদরের বানের কবিতা ১১৭৩ সালে অনিরুদ্ধ গুপ্ত রচনা করেছিলেন। নফর দাস, চণ্ডীচরণ, দ্বারকানাথ প্রমুখ কবিগণ বানের ছড়া লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দ্বারকানাথের কবিতা থেকে কিয়দংশ উদাহরণ স্বরূপ দেখান হল।

মাটেতে ছিল ধান
মাটেতে ছিল ধান পেয়ে বান আথালি পাথালি
ছিল ইক্ষু অতি দীর্ঘ চেপে গেল বালি।
রাজকর কিসে দিব
রাজকর কিসে দিব কি খাইব অন্তরে ভাবিয়া
স্থানান্তরে কেহ গেল দুঃখিত হইয়া।
কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে
কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে কুকুটাতে নিবাস থাকিয়া
জ্যেষ্ঠ ভাই কমলা তার আজ্ঞা পায়্যা।
দুখ্খ বারে বারে
দুঃক বারে বারে [কব কারে] আর কত সয়
জমির লোভে মরিবে সভে কুলবার্ধ্বা কি রয় ॥

ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' উপরি উক্ত ছড়াটি বর্ণনা

করেছেন। তিনি বানের ছড়ার আরও কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করেছেন যেমন দ্বিজলালমোহন, নরসিংহদাস, দ্বিজরাম ইত্যাদি কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি রসগৃহীত ব্যক্তিরা বর্ষা ঋতুকে বিরহ কাতরা বধূর সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। দূরে কোন প্রিয়জন থাকলে তার খবরের জন্য মন আকুল করে তোলে। 'আষাঢ়ের প্রথম দিনের' ধূমকাল মেঘ উঠতে দেখলে মন কেমন করতে থাকে। একটি গ্রাম্য ছড়ায় বিরহের ছবি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর লোক-সাহিত্য গ্রন্থে ঃ—

ও পারেতে কালো রং
বৃটি পড়ে ঝম্ ঝম্
ও পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।
এ মাসটা থাক দিদি। কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে
হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হলো দড়ি
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

এই অন্তব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রু জচ্ছাস কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ থেকে, কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নব বধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করে বের হয়েছিল। এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোন চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য দীর্ঘনিশ্বাসের মতো বায়ুস্রোতে বিলীন হয়েছে। এটা কেমন করে দৈবক্রমে শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। গ্রাম্য কবি সাবলীল ভঙ্গিমায় অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করতে পারে। এমনকি সংস্কৃত শিক্ষিত কবিগণকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। এ সকল ছড়া ছাড়া বর্ষার ওপর হেঁয়ালীও আছে যেমন

কাল গরু কাল্‌শিরে
দুধ দেয় সাত সেরে
যখন গরু মনে করে
সাতশ নদী এক করে

মেঘকে কাল গরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কাল গরুর দুধ যেমন খাঁটি ও বিশুদ্ধ হয়। তেমন বর্ষার মেঘের জল দেশের মাটিকে পুষ্ট করে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির ওপর কোন হাত নেই। তার যখন যেরকম খেয়াল হবে সেরকম করবে সেজন্য ছড়ায় সাতশ নদী এক করতে পারে বলা হয়েছে।

পৌষ পার্বণ এবং নবান্নের গান

বছরে একবার প্রকৃতির নব কলেবর হয়। বাংলা নবরূপে, যৌবনে ও নানা খাদ্য সম্ভারে সঞ্জীবিত হয়ে থাকে। হেমন্তে অগ্রাহায়ণ মাসে হয় নবান্ন। যখন কৃষকরা নতুন ফসল ঘরে তোলে তখন সারা গ্রামে ধুম পড়ে যায় নবান্নের। তাই কবি গেয়েছেন "নতুন ধান্যে হবে নবান্ন, তোমার ভুবনে ভুবনে।" হেমন্তের শেষে পুরান বস্ত্র ত্যাগ করে প্রকৃতি দেবী সোনার পাটের শাড়ী পরিধান করে। বাংলার গ্রামে যখন শীত এসে উপস্থিত হয় সে অপূর্ব। শীতের সৌন্দর্য রাশি সূর্যের সোনার আলোর সংগে মিশে পল্লীর ঘরে ঘরে সুধা রাশি ঝড়তে থাকে, তখন সকল জীবের প্রাণে নব জীবনের সঞ্চার হয়। পাশ্চাত্য কবিরা শীতকে Dirge অর্থাৎ শোকের মাস বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু বাংলায় স্বতন্ত্র। এই মাসে আসে আনন্দের নিক্কন ধ্বনি। শীতকে বসন্তরাণীর বিরহ মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। শীতের অপর মূর্তি শ্বেতপদ্মাসীনা বাণী দেবী। এ ছাড়া শীতের নানা মূর্তি বাংলাদেশে কল্পিত করা হয়েছে। বাংলা মা নব শষ্যে ও ফলমূলে সজ্জিত। তারি ভারে লজ্জিত ও অবগুণ্ঠিত হয়ে নববধূ বেশে এসে দাঁড়ায়। বাংলার আকাঙ্খিত শীত ঋতু সকল প্রাণে নব চেতনার সঞ্চার করে।

বাংলার ঋতু ছয় ভাগে এবং মাস বারটি ভাগে বিভক্ত। পৌষ ও মাঘ দুই মাস শীত কাল। বাংলায় অগ্রহায়ণ মাস থেকে শীত পড়তে থাকে, তখন নূতন ফসল কৃষকরা ঘরে তুলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে নবান্ন অর্থাৎ নতুন চাল, আখের গুড়, কড়াইসুটি, মুলো প্রভৃতি ফল ফসল গৃহদেবীকে প্রথমে ভোগ দিয়ে তাঁর প্রসাদ ভক্ষন করে। সকল দেশেই নতুন ফসল কাটা ও গ্রামের দেবতাকে প্রথমে ভোগ দেবার রীতি আছে। বাংলার এই আকাঙ্খিত দিনের জন্য কৃষকরা যেন অপেক্ষা করে। চারদিকে নতুন ধানের ও গুড়ের গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে।

পৌষমাসে পল্লীর চারদিকের শোভা আর ধরে না। খাল বিলের ঝকঝকে জলে হাঁসগুলি সাঁতার দিচ্ছে। গরুগুলি মন্থর গতিতে মাঠে যাচ্ছে, গ্রামে কৃষকদের ধান কাটা হয়ে গেছে ও মাঠে শুষ্ক কাটা খড়ের আঁটি দৃশ্যপট রচনা

করেছে, স্ত্রীলোকের আখের রসে গুড় তৈরী করছে ও ঢেঁকিতে পা দিয়ে ধান ভাঙছে। চারদিকে কর্মব্যস্তমুখরা গৃহস্থেরা আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। গাছে গাছে কলা, পেয়ারা প্রভৃতি ফলগুলি দুলছে। শ্যামা, কোকিল, বুলবুলি প্রভৃতি সংগীতপ্রিয় পাখীগুলি গান করছে। চারদিক আনন্দে কলরবে মুখর হয়ে আছে। পৌষমাস সকলের কাছে আদরণীয়। এই মাসে বধূ বাপের বাড়ী থাকে না। হিন্দুর বিবাহ নিষিদ্ধ। অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা গরীবদের শীতবস্ত্র দান করে। পৌষমাসের বড় উৎসব পৌষ পার্বণ বা 'আউনি বাউনি', তাই গ্রাম কবি গেয়েছেন—

নূতন ধানের বাউনি সেথায় সবার মন ভোলে,
নলেন গুড়ের সুবাসেতে পাড়া আমোদ করে।

পৌষপার্বনে তিন দিন ধরে প্রতি গৃহস্থের ঘরে নানা রকম সুস্বাদু পিঠে পুলি পায়েস তৈরী হয় তাই গ্রামের জনগণ পৌষমাসকে যেতে দিতে নাচার। তারা বলে ঃ

এস পৌষ যেও না
জন্ম জন্ম ছেড় না,
শীত এসে গুড়ি গুড়ি
খেতে দেবো পিঠে পুলি

এরকমের বহু ছড়া বাংলার জনগণের মুখে শোনা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় পৌষ মাসকে কত তারা ভালবাসে। গ্রাম্য ও কোন কোন স্থলে প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা ঘরের দরজার শিকলি বা আলতারায় খড় বাঁধে। রান্নাঘরের উনানের পাশে সিঁদুর কৌটা, বা কাজল দিয়ে ধানের মরই, সিঁদুর কৌটা, সিন্দুক প্রভৃতি ছবি আঁকে, চালের গুড়া দিয়ে পিঠে ও নারিকেল পুর দিয়ে নাড়ু পুর দিয়ে পিঠে তৈরী করে। বাংলার ছেলে ভুলান ছড়ায় আছে—

পৌষ মাসে বাউন বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে।

পৌষ সংক্রান্তি প্রত্যেক হিন্দু ধর্মপ্রাণ নরনারীর কাছে খুবই আকাঙ্খানীয়। এই মাসে গঙ্গাসাগর যাত্রা তারা সৌভাগ্য বলে মনে করে। তারা বলে 'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।' প্রাচীনকালে হিন্দু নারীরা গঙ্গাসাগরে পুত্র বিসর্জন দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করত। তা আইন করে বন্ধ হয়েছে। তবে মানবের মনে তীর্থ যাত্রার শুভ বিশ্বাস এখনও আছে। পৌষ মাস কেটে গেলে সকলের মন ব্যথিত হয়। একটি বারমাসী গানে আছে ঃ—

ইহ মাস গেলরে সাধু লইল মোর মনে
পৌষ মাসের দুঃখ সইব কেমনে।

পৌষ মাসের পর মাঘ মাস। ইহা সম্পূর্ণ বিরহের ও শোকের মাস, কারণ চারদিকে গাছগুলি থেকে পাতাগুলি ঝড়ে পড়ে। সকল পশু পাখী প্রকৃতি শ্যামল কোল থেকে বিদায় নেয়। মানুষেরা শীতে জর্জরিত হয়ে পশমের বস্ত্র ব্যবহার করে। চারদিকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বারমাসী গানে আছে ঃ—

ইহত মাঘ মাসে তরে পড়ে শীত

মাঘ মাসে শন শন হাওয়ার তীক্ষ্নতা ও ধ্বনি যেন তীরের মত গায়ে লাগে।

কোন গ্রাম্য কবি গেয়েছে 'ও সখি হে', এই ত মাঘ মাসে বনে গন্ধ বাও।

ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনি সকল বিরহীর হৃদয়ে হাহাকার ধ্বনিত করে। মাঘ মাসে প্রাণ চঞ্চল বাংলার পল্লীজীবন মন্থর হয়ে যায়। বঙ্গললনারা নিজ প্রিয়জনের ব্যথায় মর্মাহত হয়ে বসন্তের প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকে।

মাঘ মাসে শ্বেতপদ্মাসীনা বাণীর বীণা ধ্বনিত হয়। একটি বারমাসী গানে আছে ঃ—মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি। পঞ্চমীর পরের দিন ষষ্ঠীমাতার উদ্দেশ্যে কড়াই সিদ্ধ ও পান্তাভাত মা মনসা অর্থাৎ একটি মনসাগাছের ডালকে পুজো করে ভোগ দিয়ে পুত্রদের মঙ্গলার্থে আহার করে। তারপর মাঘ মাসে হয় ভীম অষ্টমী। কথিত আছে ভীমের মা গঙ্গায় ছাঁকা দিলে শীত চলে যায়। প্রচলিত লোক কথায় পাওয়া যায় ভীমের মা মাঘ মাসে গঙ্গাস্নান করতে চাইলে ভীম সূর্যকে খুব উত্তেজক কিরণ দিতে বললেন কিন্তু তিনি দেরী সইতে পারলেন না সেজন্য গদা পুড়িয়ে গঙ্গায় দিতেই জল গরম হল, বসন্তের হাওয়া বইতে লাগল।

বাংলায় শীত সম্বন্ধে কত প্রবাদ, কত ছড়া ও গান আছে তার শেষ নেই। একটি বারমাসী গানের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে উপসংহার করছি।

আঘন মাসে নওয়া খায়, পৌষ মাসে কাটাইয়া যায়
মাঘের শীত লাগল নারীর বুকেতে
বুকেতে বুকেতে আর বুকেতে
দারুণ পাষাণ বাঁইদাছে পতির মন বিদেশে
বিদেশে বিদেশে আর বিদেশে।

বাংলা লোক-সাহিত্যের অনুসন্ধান ও রক্ষণ ব্যবস্থা

তৎকালীন বাঙলার উচ্চশিক্ষিত জন সমাজ নিজেদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান ব্যতিরেকে গ্রাম্য জ্ঞানরাজ্যে অনুসন্ধান করে যে মণিমাণিক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তা তাঁরা আহরণ করে সযত্নে মুদ্রকের সাহায্যে রক্ষা করেছেন। যে সকল শিক্ষিত অনুসন্ধানকারিগণ লোক-সাহিত্যকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপন যত্ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম বলা যেতে পারে। তিনি ১৩১৪ সালে 'লোক-সাহিত্য' নামে গ্রন্থটি মুদ্রণ করে বাঙলার প্রাণের কথা প্রকাশ করেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে মৌখিক ব্যতীত লিখিত সাহিত্য স্থান পায়নি। তিনি নিজের ভ্রমণকালে এই সাহিত্যকে সযত্নে সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যে নূতন অংশ সংযোগ করে দেন। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা লোক-সাহিত্যের ওপর ছায়াপাত করেনি। তিনি সংগ্রহকালে একজন সাধারণ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের মত ছড়া গান ও কথা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মত সর্বপ্রতিভাসম্পন্ন কবি এই গ্রাম্যজনগণের সরল, সহজ ও স্বভাবিক সাহিত্যের গুণরাশি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন 'গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না থাক্ সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ কর আসছে। যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। তিনি সুর-তাল-লয়হীন কবি ও ও গায়কগণের গীতগুলিকে সাদরে সংগ্রহ করে বলেন, 'গ্রাম্য সাহিত্য বাঙলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে সেই জন্য বাঙালীর কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।' তাঁর প্রাণ সর্বদাই গ্রাম্য-জনগণের জন্য উতলা হত। তিনি 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েও ইউরোপীয় সভ্যতাকে দেশে আমদানী না করে আমাদের গ্রাম্য সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নিজের সৃষ্ট শান্তিনিকেতনে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের রচিত গানগুলিও লোক-সংগীতকে অবলম্বন করে সৃষ্ট হয়েছে। তিনি সারা জীবন গ্রাম্য সাহিত্যকে সজীব রাখবার জন্য বারংবার শিক্ষিত সমাজকে বলেছেন এবং সমালোচকগণকে লোক-সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলেন। 'তাঁহাদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া

দেখিবেন এরূপ অহমিকা অহংকার নহে ; পরন্তু তাহার বিপরীত। যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়িপাল্লা আছে ও তাঁহারা সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি বাঁধি বোল বাহির করিয়াছেন ; যে কোনো রচনা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা যায় নিঃসংকোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর এবং ছাপ মারিয়া দিতে পারেন।'

রবীন্দ্রনাথের সাংগ্রহিক জীবনে যে সকল লোক-সাহিত্য সম্মুখীন হয়েছিল তাদের মধ্যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' এবং 'কবি সংগীতের' স্থান সর্ব উচ্চে। তিনি বলেন 'বাঙলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।' আমাদের সাহিত্যের বিকাশ ছেলে ভুলানো ছড়া থেকে হয়েছিল—এর প্রথম পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দেন। মানব জন্মাবার পর মাকে চেনে এবং পরবর্তী জীবনে মানবের চিন্তা ও আত্মবিকাশের সহায়তা মা তাকে করে। ক্রমশ মানবজাতি পার্থিব মায়ের কাছ থেকে আত্মপ্রেরণা পেয়ে দেশ মাতৃকার সেবা করে থাকে। শিশু অবস্থা থেকে মানব যত বড় হয় ততই তার মানসিক, শারীরিক এবং দৃষ্টিশক্তিরও পরিবর্তন হয় ; 'কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর আগে যেমন ছিল তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারবার মানবের ঘরে শিশু মূর্তি ধরে জন্ম গ্রহণ করছে অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল বয়স্ক ও জ্ঞানীদের কবি ছিলেন তা নয়, তাঁর শিশু কবিতা লিখবার প্রেরণা এই ছড়া গুলি দিয়েছিল। তিনি ছেলে ভুলানো ছড়াকে শিশু সাহিত্যের অন্দরে বন্দী না রেখে এর মধ্য দিয়ে জাতিকে কত দূর সাহায্য করা যায় তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে পাই কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নূতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন কি উহাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত নীতি এবং সর্বজন-দুর্বোধ্য তত্ত্বজ্ঞানের বাসা নির্মান করিতে পারি, কিছু না হউক উহাদিগকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। তাঁর পথ যদি অন্যান্য উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ অনুসরণ করেন তা হলে আমাদের দেশের অজ্ঞানতা মুছে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে কবি ছিলেন বলে পদ্য সাহিত্যের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। সেরকম বাঙলার আর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার গ্রাম্য উপন্যাস অর্থাৎ গদ্য সাহিত্য সংগ্রহ করবার ওপর বিশেষ করে মনোযোগ দেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও নিজ আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বাঙলার নিজস্ব সাহিত্য উদ্ধার করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন 'বাঙলার গীত কথা' বা 'ঠাকুর দাদার ঝুলি'র পরিচয়ে লিখেছেন 'বাংলার মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টির পর বাঙলার উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উপন্যাসের কলাকৌশল, চমৎকারিত্ব, ভাষা এবং বর্ণনভঙ্গী হইতে চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি এবং উহার কল্পনার নানামুখী গতি সমস্তই পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্য দিয়া পরিশ্রুত হইয়া আসিয়াছে। ইহার পূর্বে 'উপন্যাস' বলিয়া বাঙলার কিছু ছিল না।' তিনি এই পরিচয়ের মধ্যে যে সকল উদাহরণের অবতারণ করেছেন সম্ভবত সে সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি তাঁকে বাঙলার লোককথা সংগ্রহ করবার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর ইঙ্গিতে দেখি 'Arabian Nights' জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আদর পেয়েছে, আপনার সফলতায় তৃপ্ত হয়েছে। আমাদের দেশের কেবলমাত্র কাশ্মীর কথাই (Folk Tales of Kashmir) কিঞ্চিৎ যত্ন পেয়েছে বিদেশীয় গুণগ্রাহীর কটাক্ষে পড়েছিল বলে।

তিনি আনন্দে অধীর হয়ে বলেছেন 'কিন্তু ধন্য আমাদের লালবিহারী, আমাদের বরেণ্য পথপ্রদর্শক। তিনি প্রাণের আহ্লাদে, অন্তরের আকুলতায় এই ধূলির ঝুলি ঘৃণায় নিক্ষেপ না করিয়া ঝাড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারই মজবুত বিলাতী ট্র্যাঙ্কে করিয়া বাঙলার কাহিনী পৃথিবীর দেশে দেশে আপনার সত্তা জানাইতে পারিয়াছে। রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও গ্রীমভাতৃ-দ্বয়ের মর্সেল, আরনেসনের আইসল্যান্ডের গল্পগুলি এবং পাওয়েলের হাইলান্ডের গল্পগুলি হইতে উৎসাহিত হইয়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে বাঙলা ভাষার অপূর্ব কেবল প্রকাশিত হয়নি। এর মূল্য একমাত্র দক্ষিণারঞ্জন নির্ধারণ করেছেন, তিনি লোককথা সাহিত্যের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন 'রূপকথা যেন গল্প, ব্রতকথা সরল ধর্মোপদেশ কাহিনী, রসকথা আমোদপূর্ণ হিতোপদেশ, গীতকথা উপন্যাস অথবা রূপকথা প্রভাত-পদ্মের পূর্ণ ডালা ; ব্রতকথা জল-শস্যসুভারা ধরিত্রী, রসকথা নিত্যোৎসবময় ক্রীড়াক্ষেত্র, গীতকথা পূর্ণিমার আকাশ স্তরে স্তরে পরদায় পরদায় ভাষা, কল্পনাসমুদয় ক্রমশ উঠিয়াছে। দক্ষিণারঞ্জন সূক্ষ বিচার পদ্ধতিতে বাঙলা লোক-সাহিত্যের বিচার করেছিলেন। এর ভেতর থেকে প্রাচীন বাঙালীর চরিত্র

বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যা সংগ্রহ করেছেন তা মুদ্রিত করে শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর সংগৃহীত কথাগুলি যা তিনি পুরুষদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন এর নাম 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' আর নারীদের দ্বারা কথিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' নাম দিয়েছেন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মধ্য দিয়ে লোককথা ও লোকসংগীতের অন্তরের গভীরতা প্রকাশ করেছিলেন।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রামতনু লাহিড়ী ফেলো নিযুক্ত হয়ে 'The Folk Literature of Bengal' সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জন, লালবিহারী, গোলাম কাদের, ফকিররাম, কবিভূষণ প্রমুখ সংগ্রহকর্তাদের সাহায্য নিয়ে বাঙলার লোক-সাহিত্যের ইতিহাস প্রনয়ণ করেন। তিনি আমাদের লোককথার সঙ্গে বৈদেশিক কথাসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"We have however, a limited number of Bengali stories, which are not of the same nature as these that have been copied by foreign nations. These have come down to us from the Buddhist times, and their striksng cxcellence from literary and aesthetic points of view have come upon us like a surprise."

দীনেশচন্দ্র বাঙলার ভাষতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব এবং সভ্যতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

বাঙলার অন্যতম সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত বীরভূমের কালেক্টর থাকাকালীন লোক-সংগীতের একটি বিরাট পর্ব উদ্ধার করেন। তাঁর মত উচ্চস্তরের সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এরকম কষ্ট স্বীকার এবং সময় অপনোদন করে দেশীয় লোক-সংস্কৃতি উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা গৌরবের বস্তু। তিনি ১৯২৯ সালে 'বাউল সঙ্গীত' বাউল নৃত্য, জারি সঙ্গীত ও নৃত্য প্ররক্ষণ ও পুনঃ প্রচলনের উদ্দেশ্যে একটি 'গণ-গীতি ও গণ-নৃত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর বীরভূমে বদলী হয়ে পল্লী সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে গবেষণা করবার জন্য ১৯৩১ সালে 'বঙ্গীয় পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এদের মধ্যে কোনটাই স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আমাদের দেশের সরকার ও জনসাধারণের অনুৎসাহিতা এবং উদাসীনতায় এ সকল সমিতি গড়ে ওঠা দূরে থাকুক জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অকালমৃত্যু হয়েছে। তাঁর 'ব্রতচারী নৃত্য' দান বাঙালী সমাজকে যে শক্তি দান করেছে তা প্রত্যেক বাঙালী মাত্রই স্মরণ করবে। তিনি একজন সংগ্রাহক গবেষক এবং উৎসাহদাতা ছিলেন। গুরু সদয়ের ব্যক্তিগতভাবে

গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান ও তৎ সম্পর্কিত গবেষণার ফলে পটুয়াদের চিত্রশিল্প ও গীতিকাব্য বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি লোকসাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করে ভারতীয় ইতিহাসের বহু প্রামান্য ও অপ্রামান্য বস্তু উদ্ধার করেছেন। তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন বাঙলার জীবনে ও বাঙলার সাহিত্যে পটগীতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাঙলার আধ্যাত্মজীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পটগীতিতে রূপায়ণ লাভ করিয়াছে সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহা কোন অভিজাত সমাজের ভাব বিলাসব্যঞ্জক সাহিত্য নয়, জাতির সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস কলুষহীন ভাব ধারায় ও কল্পনা ধারায় জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল তাহার এবং বাঙালী হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্মবিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতামাখা রূপায়ণ। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশে লোক-সাহিত্য গবেষণা ও রক্ষার নানা প্রণালী আবিষ্কার হইলেও আমাদের এই রূপ কোন প্রকার প্রচেষ্টা হয় নাই বলিলে চলে। যাহা হউক সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ অধ্যাবসায়ের গুণে যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট না হইলেও আমাদের নিকট প্রবাদের মত 'নেই মামার চেয়েও কানা মামা ভাল' বলিয়া উৎসাহিত করিবে। কিছুদিন আগে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে বাঙলার লোক-সাহিত্যের আদি-অনন্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। তিনি ছাড়া ক্ষিতিমোহন সেন, মনসুরউদ্দীন এবং বহু সাহিত্যিক বাঙলা লোক-সাহিত্যের রক্ষা করবার জন্য বিশেষ যত্ন করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লোক-সাহিত্য এবং চিত্রকলা সংরক্ষণ করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

কিছুদিন আগে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে আমি 'এশিয়াটিক ফোক লিটারেচার সোসাইটি' বা এশিয় লোক-সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সকল দেশের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে ছিলাম। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লোক-সংগীত' সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম এবং এর একটি পুস্তকাগার ও যাদুঘর করে লোক-সাহিত্য যাতে চিরকাল জীবিত থাকে এবং বাঙলার জনগণকে শিক্ষা দিয়ে উৎসাহিত করতে পারে এর বিশেষ যত্ন করেছি। আমার জনগণের প্রতি অনুরোধ তারা যেন লোক-সাহিত্য সংগ্রহ সঙ্কলন ও

সংরক্ষণ করে আমাদের বাঙলার সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ রাখেন। আর তাঁদের সকল সময়ই নীচের কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে।

(১) মৌলিকতার ওপর দৃষ্টি রেখে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করা।

(২) প্রকৃতির ওপর আন্তরিক আকর্ষণ থাকা আর গ্রাম্য জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন হওয়া চাই।

(৩) প্রাচীন ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন এর অনুশীলন করে এর অন্তর্নিহিত ভাব আদর্শ ও আঙ্গিকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করা।

(৪) লোক-সাহিত্য ও লোক-চিত্রকলার সাহায্যে পল্লী বাসীদের শিক্ষা দেওয়া।

যাঁরা আজও লোক-সাহিত্য আবিষ্কার করবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁদের এ চারটি বিষয়ে বিশেষ অনুশীলন করা কর্তব্য।

লোক-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক পরিপূর্ণ সাহিত্য তৈরী করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার ও সাহিত্যে অবয়বে নতুন রক্ত সঞ্চারিত করে ছিলেন তার মূল লোক-সাহিত্য। তার কবিতায় বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন প্রভৃতি লোক-সংগীতের ভাব ও প্রভাব দেখা যায়। তিনি প্রথমে এই বাউল গানের ছন্দে তাঁর কবিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের সহজ সরল ভঙ্গিমা এবং মিঠে সুর পাঠককে এতই মুগ্ধ করে যে তা বার বার পাঠ করলেও তৃষ্ণা মেটান যায় না। সর্বদাই তাঁর সাহিত্যের মধ্যে গীতগুলি উর্ধমুখী উচ্ছাস বহন করে পাঠকের কানে মধু বর্ষণ করে। তাঁর গানের হৃদয় নাচান ছন্দ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তৈরী হবে কিনা সন্দেহ। মানবের হৃদয় তন্ত্রে তার এক একটি সুর যখন আঘাত করে তখন মনে হয় এই সুর কতকালের পরিচিত কতবার আমরা শুনেছি কিন্তু ধরতে পারিনি। পূর্বে কেবল ঠুংরী, টপ্পা, খেয়াল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সংগীত শুনতে শুনতে আমাদের জীবন নীরস হয়ে গিয়েছিল তাতে রবীন্দ্র সংগীত অমৃত বর্ষণ করল। বাংলা তার হারান গান খুঁজে পেল। বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক খুলে গেল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পাঠে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' তা থেকে তাঁর শিশু হৃদয়ে শ্যামল বাংলার সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি বাগানে, পুকুরের ও সবুজের সঙ্গে খুব ছোট বেলা থেকে প্রকৃতিদেবীর বীণা শুনতে পেতেন। একটু বড় হতে তাঁকে জমিদারী দেখতে যখন শিলাইদহ যেতে হত সেখানে 'মনের মানুষকে' দেখলেন যাকে তাঁর গুপ্ত হৃদয় এতদিন সন্ধান করে ফিরছিল। তখন থেকে তাঁর মনের সন্ধানী মানুষটি বাংলার লুপ্ত প্রায় ইতিহাসের পাতা খুঁজছিলেন, তাঁর শহুরে সাহিত্যিক জীবনে তার অপব্যবহার করেন নি যখনই সময় পেতেন তিনি আসল মানুষের পরিচয় পাবার জন্য ব্যস্ত হতেন। তাঁর পূর্বে কোন বাঙালী সাহিত্যিক এই লুপ্ত প্রায় জীবন ইতিহাসের পাতা খুঁজবার বার হননি। তিনি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বাংলার গ্রাম থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনি সাহিত্যের কোন দিক বাদ দেননি সমস্ত দিক দিয়ে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন

করেছিলেন। তিনি যখন শিশু ছিলেন তখন বাড়ীর চাকর-ঝিদের কাছ থেকে গল্প ছড়া শুনেছিলেন তা তাঁর অনুসন্ধানী জীবনে কিছু সাহায্য করেছিল। তিনি এমনকি কলকাতায় একটি বাউল গান শুনে তা শিলাইদহের বলে চিনতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের বেশীর ভাগ সময় গ্রামে অতিবাহিত করেন। সহজ, সরল ও ছন্দময় গ্রাম্য জীবনে ভগবানের অশেষ কৃপায় তাঁর জীবনে সর্বাঙ্গীন ভাবের অভিব্যক্তি ফুটেছিল, তিনি গ্রাম্য সাহিত্যের নব উদ্দীপনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। গ্রামের ছোট ছোট জীবনের বাক্যগুলি কত সুন্দর ও জীবন্ত তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তিনি রাজসাহীতে যখন পদ্মার ওপর দিয়ে যেতে যেতে একটি মাঝির গান শুনলেন, গানের দুটি কথায় সাড়া গ্রাম কথা কয়ে উঠল। সে গানের মধ্যে উচ্চস্তরের মনের ভাব প্রকাশ না করলেও তার মধ্যে মানবের মনের কথাটি বেশ বুঝা যায়। বাংলার প্রতিটি গ্রামে ঝিঁঝিঁর কিচ কিচ আওয়াজ সেইটি যেন একটি ছন্দময় তার ওপর কর্মক্লান্ত ম্যালেরিয়া জর্জরিত গ্রামবাসী যে সাহিত্য তৈরী করে তা কালিদাস, ভবভূতি অনুরূপ কাব্য সৃষ্টি হবে না। সে স্থান থেকে হৃদয়ের করুণ আবেগময় ইতিহাস নিয়তই বার হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মানুষের পক্ষে ইহার একটা নিতান্ত প্রয়োজন আছে। যে সকল সাংসারিক ব্যাপারের দ্বারা সে সর্ব্বদা ঘনিষ্ট ভাবে পরিবৃত তাহাতে সে ছন্দে লয়ে মন্ডিত করিয়া তাহার উপর নিত্য সৌন্দর্যময় ভাবের রশ্মিপাত করিয়া দেখিতে পায়।'

সেই জন্য জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলছে সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা নামের মোটারী হচ্ছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে একটা সাহিত্যের গঠন কার্যও চলছে, তার বিশ্রাম নেই। প্রতিদিন যা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খন্ড খন্ড ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সাহিত্য তাকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলছে এবং তার ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একই রাগিনী বেজে উঠবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাচ্ছে।

পদ্মা বেয়ে চলতে চলতে বালুচরের মধ্যে যেমন, চকাচকীর কলরব শোনা যায় তখন তাকে কোকিলের কুহুতান বলে কারও ভ্রম হয় না তাতে পঞ্চম মধ্যম কড়ি কোমল কোন প্রকার সুর ঠিক মতো লাগে না এ নিশ্চয়, তবু একে পদ্মাচরের গান বললে কিছুই অসংগত হয় না। কারণ, এতে সুর বেসুর যাই লাগুক সেই

নির্মল নদীর হাওয়ায় শীতের রোদে অসংখ্য প্রাণীর জীবন সুখ সম্ভোগের আনন্দ ধ্বনি বেজে ওঠে।

গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না থাক্ সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করে আসছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজিয়েছে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে তাপ দান করে। পদ্মাচরের চক্রবাক্ সংগীতের মতো তা নিখুঁত সুর তালের অপেক্ষা রাখে না। মেঘদূতের কবি অলকা পর্যন্ত গিয়েছেন, তিনি উজ্জয়নীর রাজসভার কবি, আমাদের অখ্যাত গানের কবি কঠিন দায়ে পড়েও পাবনা শহরের বেশি এগিয়ে যেতে পারে নি। যদি পারত, তবে তার গ্রামের লোক তার সঙ্গ ত্যাগ করত; কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধতে পেরেছে এবং সেকারণে তার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নয় বরং সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

সেজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিচ্ছে তাকে কাব্য হিসেবে গ্রহণ করতে গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়িয়ে নিয়ে পাঠ করতে হয়, তারাই এর ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ব মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করে তোলে। গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবি, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে সেজন্য বাঙালির কাছে এর একটি বিশেষ রস আছে।

রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যজীবনকে উপলব্ধি করে তার মধ্য থেকে সাহিত্য বার করে ছিলেন। তাঁর জীবনে এটি ছিল কুতূহলী দিক্। সে দিকটি শিশুর জ্ঞানকে যৌবনের পথে খাদ্য সংগ্রহ করবার সাহায্য করে। তিনি চিরকালই শিশুর মত একটি জিজ্ঞাস্য নিয়ে থাকতেন, এত পেয়েও তাঁর পাবার আশা ক্রমশই বৃদ্ধি হত। তাঁর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি যদি আমরা তলিয়ে দেখি তাহলে দেখব তিনি জীবনের সমস্ত দিক বাংলার গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শিশুদের প্রতি যে ভালবাসা তা তাঁকে 'ছেলে ভুলান ছড়া' সংগ্রহ করবার প্রবল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি ছড়াগুলি সম্বন্ধে বলেছেন 'ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে' এজন্য এর অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা দেখা যাবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তার মধ্যে কোনটাই বর্জনীয় নয়। কারণ, ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলে কিছু নির্ণয়

করবার উপায় অথবা প্রয়োজন নেই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হয়ে আসছে যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য থেকে কোনো একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করে নেওয়া সংগত হয় না।' ছড়াগুলির মধ্যে একটি সুর আছে যে স্বরটি গানের রূপান্তরিত করলেও কোন পাঠ হানি হয় না। রবীন্দ্রনাথ যদিও সুর দেখেই সংগ্রহ করেননি তিনি প্রতিটি ছড়ার ছন্দেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। মা খোকাকে কত রকম গানে ঘুম পাড়ায় তার শেষ নেই। খোকাকে কতভাবে আদর করে তার এই ছড়ার মধ্যে দেখা যায়। কুমারী জীবনের কামনা মা হবার জন্য। মা হয়ে মেয়েরা যদি খোকা পায় তাহলে নিজের জীবনকে স্বার্থক বলে মনে করে। যেমন একটি ছড়ায় দেখা যায়ঃ—

'খোকার আমার নিদন্তের হাসি
আমি বড়ই ভালবাসি।'

তাঁর সংগ্রহের মধ্যে দেখা যায় ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে রসিকতাও ছিল। ছোট ছোট মেয়েরা শিব পুজো করে তার মত স্বামী পাবার আশায় সেইরকম সুন্দর মনে ধারনা তারা ওলট পালট করতে চায় না। ছোট ছোট মেয়েদেরকে যদি তাদের ভবিষ্যত স্বামীর ওপর ঠাট্টা করে রসিকতা করা হয় তা হলে তারা বড় রেগে যায়। একটি ছড়ায় আছে।

'ওই আসছে খোঁড়া জামাই ডিং ডিং বাজিয়ে
ক্ষীরের হাঁড়িতে দই প'ল ছাই খাক্ সে।'

এ ছড়াটির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকলেও বেশ 'বিদ্রূপাত্মক সুর মিশ্রিত আছে। ছড়াগুলি খুব তাড়াতাড়ি ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর খুব শীঘ্রই কাজ করে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে সেই মাধর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে। তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তি সংগতিহীন। শুধুমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদ বশতঃ সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি বহু-কাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারের এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া

আসিয়াছে ; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের আজ মাতৃ মাতামহীদের স্নেহ সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে। এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃ-পিতামহদের শৈশব নৃত্যের নূপুর নিক্কন ঝংকৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের স্রোতে ছোটো বড়ো অনেক জিনিষ অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলিকে যে পদ দিয়েছেন এবং ছড়ার মধ্যে যে রস আছে তাও প্রমাণ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েও তাঁর দেশের প্রতি ভালবাসা কতখানি ছিল তা এই সংগ্রহ থেকে বোঝা যায়। আজকাল জনশিক্ষার ধুয়া উঠেছে। পূর্বে আমাদের দেশে জন শিক্ষা হত প্রথমে মায়ের হাতে তারপরে গ্রাম্য-কবিদের হাতে আমাদের দেশের কবির দল কাব্যসাহিত্যকে পুষ্ট করত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছে 'গীত কবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং গীতি কবিতাই বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী —বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো ; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গানের সৌন্দর্য। রাজসভা কবি রায় গুণাকারের অন্নদামঙ্গল গান। রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" তিনি নিজে বিরাট কবি হয়েও, নিজেকে সংগ্রাহী হিসেবে খুব স্বতন্ত্রভাবে দেখতেন এবং সেজন্য তাঁর গবেষণার কাজ খুব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মন সর্বদাই এক অজানিত এ সকল কবিতার আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকত। বাংলার হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ প্রতিটি কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এ দুটি নাম ছেড়ে 'আমি' ও 'সে' বলা হয়েছে। এ দুটির দাম্পত্য জীবন বাঙালীর জীবনে স্বতই প্রবাহিত হচ্ছে, তাঁর জীবনে এই অনুসন্ধানী পথটা এতই সঙ্কট ও কণ্টকপূর্ণ তা প্রত্যেক অনুসন্ধানী মাত্রই অনুগত আছেন। আমাদের জীবনের মহানরূপ আমরা এই গ্রাম্য সরল সাহিত্য থেকে অনুভূতি লাভ করেছি। তাঁর কাব্যের প্রতিটি কথা আমাদের গ্রাম্যছন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদেয় এল বান' এই কবিতায় প্রথম লাইনটি গ্রাম্য কবিতা থেকে গৃহীত। অমিয় চক্রবর্তী তাঁকে 'Primitivist Poet' বলেছেন। তিনি 'Rabindra Nath on Bengal's Folk Literature' নামক বক্তৃতায় বলেছেন—

"Rabindranath Tagore was universal because he was regional, he had touched the 'Universal Concrete' and by sending his creative roots deep down in the soul of Bengal, the poet had effected contact with perennial springs of inspiration. Bengal's customs and Folk-Lore, her mythologics and her bautiful old crafts Bengal's songs sung by her boatmen and by the tillers of the soil, the old and vital words that are still used by the peasants, entered into the heart of his verse. His songs are resonants with folk tunes, and folk rhymes just as poetry is filled with Poetry of common Life. (Proceiding of the Asiatic Folk Literature Society Vo l l, No. 1. 1944)

অর্থাৎ এককথায় রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় বিশ্বের কারণ তিনি ছিলেন আঞ্চলিক। তিনি বাংলার অন্তস্থলে প্রবেশ করে তার থেকে লোকসাহিত্যের মণিমানিক্য আহরণ করেছিলেন তাই তাঁর গান ও কবিতা বিশ্বের লোকের মর্মে প্রবেশ করে।

বাংলার লোকসংস্কৃতি

বাংলাদেশের সমতলভূমিতে সরল স্বাভাবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা যেন বিশ্বের সকল রূপকে এক পাত্রে তুলে বিশ্ববিধাতা এ জায়গায় বসিয়েছেন। শ্যামল প্রান্তর, সবুজ ঘন বন, নীল আকাশ, হরিদ ধান, শুভ্র হিমালয় বাংলার অঙ্গকে শোভিত করেছে। সকলই স্বচ্ছ সেজন্য তার ভেতর থেকে জ্ঞানের আলো দেখা যায়। বাঙালী জন্ম থেকে বংশ পরম্পরায় সরলতাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাদের সাদাসিধা শুভ্র কাপড় ও চাদর বেশভূষা, সদাই জ্ঞানের অনুসন্ধানে নিয়ত ধ্যানী এবং দুঃখকে হাস্যবদনে জয় করেছে। তাই বাঙালী অসি অপেক্ষা মসির দ্বারা বিশ্বকে জয় করেছে। বাংলায় কত জাতি মিলিত হয়ে এবং কত জাতি পঙ্গপালের মত নীল আকাশ মেঘাবৃত করে সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ছারখার করেছে কিন্তু বাংলার মাটি এমনই সুজলা সুফলা এবং শষ্যশ্যামলা যে বীজ বপণ করলেই সকল ক্ষেত্রগুলি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর ওপর মসৃণ, দেখতে খুবই নরম কিন্তু মাংসপেশীগুলি কঠিন, প্রাণের ভেতর দয়ার্দ্র এবং ক্ষমাগুণে মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। প্রাণের মধ্যে এরকম দয়ালু ও অতিথিপরায়নতার ভাবে ভরপুর যে তার সংস্পর্শে এসেছে সেই পরিচয় পেয়েছে। এ বাংলার খাঁটি বৈশিষ্ট্য প্রচার করেছে। বিদেশী যতই শত্রুতা করুক না কেন বাঙালীর ঘরে কান্তমুদীর মত সরল অতিথিসৎকার পরায়ন ব্যক্তি শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে রাত্রে স্থান দিয়ে, শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এবং নিঃসংকোচে গ্রাম্য বধূ অতিথি সৎকার করেছে। অতিথি সেবায় তারা এতই বিহ্বল হয়ে পড়ত যে নিজে এক মুষ্টি অন্ন না খেয়ে অতিথিকে নারায়ণ ভাবে সেবা করে এসেছে। বাঙালীর সরলতা, সরল বিশ্বাস ও মৃদু স্বভাব এ জাতের ভাগ্যে পরাধীনতার কলঙ্কলেপন করলেও তারা কোনদিন স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে নি। বাপ পিতামহর বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে থেকে তাদের জীবনকে ব্যথিত করে তুললেও কোনদিন বিনয়ীভাব ছাড়া রূঢ়তা প্রকাশ করে নি। সকল দেশের কাছে পরাজয় স্বীকার নিভৃত জনশূন্য পল্লীতে কুটীর তৈরী করে সভ্যতার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। বাংলাদেশে মাটীর তৈরী বাস্তব ছবি এবং

তরল মনের সৃষ্টির কল্পনা শিল্পীর মনের কাল্পনিক রূপকে প্রস্ফুটিত করে। পাষাণের ভেতরে প্রাণ সঞ্চার করা দুঃসাধ্য বলে অন্য প্রদেশের পূজারীগণ সে চেষ্টা না করে বার্ষিক পূজা করে থাকে কিন্তু বাংলার পূজারীরা মাটির ঠাকুর তৈরী হলে প্রাণ সঞ্চার কোরে পূজা করে এমনটি কোথাও হয়নি। তারা কখনও পুরাণকে স্মৃতির মধ্যে জড়িয়ে রাখে না। ঠাকুর বা দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করে পূজা হয়ে গেলে বিসর্জন দিয়ে আবার নতুন কল্পনায় মেতে ওঠে। তাই বারমাসে তের পার্বনের মধ্যে মূর্তি গড়ার জন্য কুমোরের সৃষ্টি হল। সবসময় শিল্পব্রতী ও শিল্পবিদ্যানুরাগী শিল্পী জনসমাজ বাংলার ধর্ম সাহিত্য ও সমাজকে ক্রমোবর্ধমানের পথে অগ্রসর করেছিল। যারা মানুষের কৃষ্টিকে এগিয়ে দিয়েছিল তার পরিবর্তে কেবল লাঞ্ছনা, অবমাননা, অবহেলা এবং নির্যাতন সহ্য করেও নিজেদের সত্য পথ থেকে কখনই পদস্খলিত হয়নি বরং কারও কাছে মৌখিক উৎসাহ পেলেই দ্বিগুণ উদ্দীপনায় নিজ কাজ করে যায়। ধ্যানী শিবের মূর্তির প্রভাব বিশেষ করে বাংলার শিল্পীর হৃদয়কে মিলিত করেছিল। সেই ধ্যানী মূর্তি সে স্বর্গমর্ত এমনকি সকল বিশ্বচরাচরে দেখেছে। ধ্যান গম্ভীর মূর্তি কালবৈশাখীর সৌন্দর্য শিল্পীর চোখকে স্তব্ধ করেছে, দুটি চোখের মধ্যে শিল্পী সকল বিশ্বকে একনিমেষেই হৃদয়গ্রাহী করে মূর্তির রূপ দিয়েছে। এ শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় হোক তাতে কিছু এসে যায় না ; এ ভেতর শিল্পীর উদাসী কল্পনা এবং বাস্তব প্রকৃতির রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ শিল্পগুলি এমনই সুন্দর যে মানবগণ হৃদয়ের ভক্তি, অশ্রু অর্ঘ এবং ফুলের অঞ্জলি দিয়ে পূজা না করলে শিল্পীর সৃষ্টির অবমাননা করা হয় এজন্য সকলে পূজা করেছে। একে পৌত্তলিকতা বা এরকম কোন বৈদেশিক হীন কথা ব্যবহার করে শিল্প ধ্বংস করা কিছুতেই যুক্তি সংগত হবে না।

বিশ্বচরাচরের যে পূর্ণ প্রকৃতি নানারূপে মানবের মাঝে এসে সুরে ও বাণীতে প্রতিটি গাছের পল্লবে, নদীর কুল কুলু ধ্বনিতে, বায়ুরস্তরে, আগুনের শিখায়, সূর্যের রশ্মিতে এবং ঝরণার ধারায় ফুটিয়ে তুলবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেই প্রকাশিত হয়। এ দেশের বাগান দেখে স্বয়ং দেবীও লোভ সংবরণ করতে না পেরে মর্ত ভূমিতে পদার্পণ করে আর ফিরে যানান। বাংলার দেবী নিজে স্বতন্ত্র ভাবে তার সন্তানদেরকে কৃত্রিমতা থেকে দূরে সরিয়ে কেবলমাত্র খাঁটি অর্থাৎ সত্যের উপাসনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সকল দেবদেবীকে

বাঙালী এমনই আপনজন করেছে যে তাদের নিয়ে চরিত্রের পটভূমি রচনা করেছে। মানবের মধ্যে নারায়ণের প্রকাশ এ দেশের জনমানবগণ নানারূপে দেখেছে। তারা সময়ই সন্ত্রস্ত। কখন কোন বেশে স্বশরীরে ভগবান দ্বারে আসবেন, সে ভাবনায় কাউকেও ফেলে বা তুচ্ছ করতে পারে না।

বাংলায় কত জাতি মিলিত হয়েছে কত জাতি কত প্রকার সভ্যতা আমদানী করেছিল কিন্তু বাঙালী সভ্যতাকে নিজ হাতে গড়ে ভেঙে আপন বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছে। এ মাটিতে সকল উচ্চ দার্শনিকের নিগূঢ় তত্ত্ব সহজ সরল রূপে যেমন গঙ্গা ও সাগর মিলে মহাতীর্থ হয়েছে সেরকম উচ্চ আদর্শ গ্রাম্য এবং সাংস্কৃতিক সভ্যতা মিলিত হয়ে বাংলার গ্রামে ধ্বনিত হচ্ছে। বাংলা থেকে অহিংসা মন্ত্র মানবকে যে দীক্ষা দিয়েছিল তা সকল দেশের কাছে পরাভব স্বীকার করে কখনও নিজের বীরত্ব না দেখিয়ে ক্ষমা করেছে। হয়ত অন্য সকল দেশ দুর্বল বলে উপহাস করত কিন্তু তারা যদি বাঙালী জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে তাহলে দেখবে সকল বীরদের জন্মভূমি এই বাংলার শান্তিপ্রিয় বাঙালী গৃহ সংসার ও মনুষ্যজাতির সৃষ্টিকে কেবল প্রবল জাতির হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। তারা দস্যুদেরকে প্রতিরোধ করবার জন্য চেষ্টা করলেও বিশেষ সফলকাম হয়নি। তাই বাঙালিজাতির বাইরের আক্রমণে অধঃপতন হল। বাংলাদেশের সূক্ষ্ম শিল্প নষ্ট হল। তাদের প্রাণের মধ্যে সদাসর্বদা যে কৃষ্টির চক্র ঘুরছে তাতে কেবল এ জাতি ছাড়া আর কারও অধিকার হয়নি। ঘরের বাঁধন অপেক্ষা বাইরের স্বপ্ন তাদের জর্জরিত করে দিয়েছিল। শত দুঃখ, দৈন্য এবং কষ্টের মাঝখানে জীবনের প্রতিনিয়ত কর্মে, অনধ্যানে এবং স্বপনে যেন আবেশ করেছে। তারই ব্যথিত স্বর বহ্নিবর্ণ পাহাড় থেকে উদ্গীরণ হচ্ছে।

বাংলার সাধনা দুঃখের উৎস থেকে নিসৃত হয়ে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি মানব জীবনের সংস্কৃতিকে গড়েছিল। দুঃখের অজ্ঞান ও অপ্রেম বাঙালীর দুঃখকে ছুঁইতে পারেনি। এই দুঃখ জীবনকে নানা পথের সন্ধান দিয়েছে। দুঃখ থেকে উদ্ভূত দর্শন শাস্ত্র জ্ঞান রাজ্যের সন্ধান দেয়। শিশুর মত ক্রন্দনে ভক্তের কাছে দেবতা ধরা দিয়েছে। ধন, মান, যশ প্রভৃতি পার্থিব সকল অভীপ্সিত বস্তু অপেক্ষা কেবল সব পাওয়ার দেশে যাবার জন্য ক্রন্দন করেছে। এ স্থানে সকলেই মৃন্ময় চিন্ময় দীপ জেলে জীবন তরণীর নাবিক হয়ে কতশত পাপীতাপীকে উদ্ধার করেছিল। দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব সহজ সুরে লোকের মধ্যে

প্রবেশ করল। এখানকার মানবের প্রাণের দুয়ারে কেবল অজ্ঞানিত ব্যথা জেগে উঠেছে তা একমাত্র সাধক ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে না। মোটামুটি দ্বৈত, অদ্বৈত, মায়াবাদ এবং পূজাঅর্চনা তারা কবিতা ও গানের মধ্য থেকে প্রকাশ করেছে। বিরাট চিন্তাধারার মর্মবাণী লোকগীতের মধ্য থেকে প্রকাশ হয়েছে। জ্ঞান আলোকের রশ্মি সকল ব্যক্তির ওপর সমভাবে পড়ে উচ্চনীচুভেদ এবং আমিত্ব জ্ঞান দূরীভূত করেছিল। আর এ সকল বাণীকে মানবের দুর্দিনের মাঝে শান্তির জলের মত বর্ষণ করেছে। যে চলে তার আত্মা বিকশিত হয়। চলতে চলতে শ্রান্ত হলেও যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ চলতে হবে। থামলেই অজ্ঞান, অন্ধকার এবং মৃত্যু জড়িয়ে ধরবে। সত্যকে অবলম্বন করে যে এগিয়ে চলে তার কখনও ভয় থাকে না। সে আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি আহরণ করে তমসা নাশ করে থাকে। সে ক্রমশঃ সত্য শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় তাকে কেউ ভেদ করতে পারে না। তাকে ধর্ম রক্ষা করে। বাংলার ধর্মের সঙ্গে দর্শনের প্রভেদ হয়নি। সাধক সকল সময় ধর্ম অর্থাৎ কাজ করবার আগে দেখে দর্শন সম্পন্ন করে। ক্রমশঃ এই ধর্মকে নানা পর্যায়ে ভাগ করা হল। সেবা, প্রেম প্রভৃতি একত্র করে নাম করণ করা হল মানবধর্ম। তারপর ক্রমশঃ ধর্ম মানবের উচ্চ সার্বভৌমিক মানবতা ত্যাগ করে জড়তা এবং স্বার্থসিদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল ধর্মের দেউল। সে স্থানে দেবতা কেবল প্রস্তর নির্মিত এবং মিলনের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিচ্ছে। সেজন্য মানবগণ কোন তীর্থ দর্শন করে তৃপ্ত হয় না। প্রাচীন মহাসত্যের সাধনাকে নিবদ্ধ করল পুস্তকে যেখানে শুষ্ক প্রাণহীনতা বিরাজ করছে সেখানে মহামানুষের সন্ধান নেই। তারা অবাস্তবের পেছনে নিজের কামনা, বাসনা এবং অপ্রাকৃত বস্তু যাঞা করছে। সেজন্য চারদিক আত্মা মুক্ত না হয়ে কেবল বন্ধন হয়েছে। বাংলার দর্শনের প্রধান কথা হল ত্যাগ। দেশত্যাগী বা গৃহ-ত্যাগী না হলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না সেরকম স্বার্থত্যাগী না হলে দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। সংসারে ত্যাগ স্বীকার না করলে প্রিয়জনকে ভালবাসা যায় না। যখন মানব ক্রমশঃ ত্যাগ স্বীকার করে তখনই অমরত্ব লাভ করতে পারে। এই ত্যাগ স্বীকার মানব সম্পূর্ণ করতে পারে না বলে তার সকলেই শূন্য, নিরাকার এবং মিথ্যা বলে মনে করে। তাই লালন ফকিরের গানে এর একই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই।

সাধন বিফল ব্রজক [বরজখ] বিনে,

এখানে সেখানে রজক, রজক ঠিক দেখ মনে।
রজক ঠিক না হয় যদি, ভুলাইবে
... ... শয়তান গিধী।
ধরি রূপ অনাবিধি, এখন তারে চিনাবে
........................কি প্রমাণে।
নৌকা নাইকো বিনা পারায়, নিরাকারে
মন কি দাঁড়ায়।
লালন মিছে ঘুরিয়ে বেড়ায়, অধর ধরিতে চায়
রজক না চিনে।

মানবের মধ্যে সাধনা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জেগে উঠেছিল। ধর্মের ভয় বাংলাদেশে ছিল না। সহজ উপায়ে ভগবান সাধনায় সিদ্ধিলাভ কেবল এখানে সম্ভব হয়েছিল। রামকৃষ্ণ বলেছেন 'যদি পাগল হইতে হয় ঈশ্বরে পাগল হইব।' এরকম প্রত্যেক সাধক কবি ভগবৎ চিন্তায় পাগল হয়ে যেত। যুক্তি-তর্কের ভেতরে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। এই তর্কজাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শ্রীচৈতন্য নিজের রচিত ন্যায়ের পুঁথি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছেন। সকলেই সমস্বরে বলে গেছেন, তর্ক কিংবা যুক্তির দ্বারা মহামানবের তত্ত্ব বুঝান সম্ভব নয়। এ বুঝাতে হলে প্রেম, ভক্তি এবং সাধনার দ্বারা অনুভব করতে হবে। বাংলার সাধনার মূলতত্ত্ব প্রেম। ভালবাসাই প্রেম নয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে প্রেম নিছক কেবল ভোগ লালসা চরিতার্থ করা এর তত্ত্ব বুঝতে হলে গুরু আগে স্থির করা প্রয়োজন। প্রেমের মূলেই ত্যাগ মহান হয়েছে। প্রেমিকের মধ্যে যদি জীবন্ত প্রেম থাকে তাহলে এক প্রেমিকের মৃত্যু হলেও সেও সহগামী হয়। গ্রাম্য কবি গেয়েছে ঃ—

প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা, গুরু ধরো চিনে।
প্রেমেতে এই জগত বাঁধা,
মোহম্মদ আর আপনে খোদা,
হায় গো প্রেম করো মন প্রেমতত্ত্ব জেনে।
চন্ডীদাস আর রজকিনী,
প্রেম করেছিলো তারাই শুনি,
আর এক মরণে দু'জন ম'লো প্রেম-সুধা পানে।

সকল ধর্মসাধকই প্রেমকে খুব উচ্চ বলেছেন। এই প্রেমের পথে বিপদ থাকলেও খাঁটি প্রেমিক সকল বাধাকে জয় করে এমন কি অত্যুচ্চ শৃঙ্গ থেকে এবং জ্বলন্ত আগুনে দ্বিধা বোধ করে না। যেজন খণ্ডিত প্রেমকে ব্যাপ্ত করে দিতে পারে সেই পরম প্রেমাস্পদের সন্ধান পায়।

বাংলার সভ্যতা আর্য ও অনার্য সংগমে উদ্ভূত হয়েছিল। এর ভেতরে উভয়ের সভ্যতা যেন একই গ্রন্থিতে পরস্পরে জড়িত। সকল ধর্ম বাংলায় ভিন্ন ভাবে প্রচারিত হলেও কিন্তু হিন্দু ধর্মের ভাব ধারায় সবই একীভূত হয়ে গেছে। আর্যেরা বৈদিক ধর্ম এবং অহিংস প্রচার করলেন। সভ্যতার মূলে উৎপত্তি আর্যেরা বিস্তার করলেও দ্রাবিড়েরা ভক্তি ও প্রেম যুক্ত করল। নানা বিবর্তনের মধ্যে হিন্দু-ধর্মের বুনিয়াদ শক্ত হয়েছিল। ভারতের ভূমিকে দুইজাতি কর্ষণ করে ঐশ্বর্যশালী করে তুলল। দু-জনকার আদান প্রদান এবং অন্যান্য সামাজিক রীতিনীতি মিশ্রিত হয়ে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা ভারতীয় সভ্যতা নামে খ্যাত। আমরা যদি পৃথক ভাবে আর্য ও অনার্য বিশ্লেষণ করি তাতে বেশী ভুল হবার সম্ভাবনা। বর্তমানে মাদ্রাজী অর্থাৎ দ্রাবিড় জাতি, অন্যান্য প্রদেশে জাতিগুলি আর্য আদিবাসী মহাভারত এবং রামায়ণ গ্রন্থ থেকে এ সকল জাতির বর্ণনা পাই। এর পর আদিবাসী ছারা আর্য ও দ্রাবিড় মিশ্রিত হয়ে বাংলার জাতি সৃষ্টি হল। আর্য সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করলেও অনার্যদের ত্যাগ করেনি। তারা নাগজাতির কাছ থেকে লৌকিক বহু প্রথা গ্রহণ করে নিজেদের জাতির সৌষ্ঠর বৃদ্ধি করেছিল। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি প্রথা দেওয়া হল। 'শাঁখা আর্যেরা জানতেন না, শাঁখা সিঁদুর প্রভৃতি এয়োর চিহ্ন নাগদের কাছে পাওয়া। নৃত্য-গীত-বাদ্যও আর্যরা অনার্যদের থেকেই পেয়েছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নৃত্যগীত করা নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্র ও নারীরাই তা করতে পারতেন। লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি দেখলে তা বুঝা যায়। তবু সমাজে গীত বাদ্য যাদের জীবিকা তাদের স্থান খুব নীচে ছিল। নাটকেও আর্যরা এদেশে অনেক কিছু ঐশ্বর্য লাভ করেছেন অনার্যদের কাছ থেকে। একদিন অনার্য এবং আর্য সভ্যতা মিশ্রিত হয়ে যে সভ্যতার সৃষ্টি হল তাতে সাকার ও নিরাকার কল্পনা বিশেষতঃ তারা আত্মসাধনায় নিজেদেরকে তন্ময় করেছিল। ধারাবাহিক চিন্তাধারায় মগ্ন রক্ষণশীল দল সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করল। আর একটি দল যারা কেবল সকল সময়ই অন্নের সংস্থানে ব্যস্ত তারা কর্মক্লান্তিকে লাঘব করবার জন্য কথা, গান, পাঁচালী প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি

করে জীবনের আনন্দরসকে ব্যাহত হতে দিত না। এই প্রবাহমান কৃষ্টি বাঁধা না পেরে তা প্রতিদিন নানা ভঙ্গিতে উজ্জ্বল গতিতে গিয়ে মিশত। তারা মহা-নির্বানের জন্য মহাপ্রস্থানের পথে যেত না। দেবী আদ্যাশক্তিকে গানের ভেতর দিয়ে দেখতে পেত। কঠিন ধর্ম তাদের ছুঁতে পারে নি। সেজন্য বাংলার সংস্কৃতি গ্রামের মধ্যে থেকে মানবীয় মুক্তির পথ খুলে দিয়েছে। সারা জনমের সাধনায় ভক্তের এক মুহূর্তে আহ্বানে দেবতা ছুটে এসেছে।

সংস্কৃতি 'ভারবহনকারী ব্রত নিত্য নিয়ত নারীর প্রাণে শিল্প এবং সৌন্দর্য প্রবল প্রভাবে বিস্তার করেছে। সাংসারিক এবং সামাজিক মিলনের সেতু নারী রচনা করেছে ব্রত উদযাপনের মধ্যে। গ্রাম্য দেবদেবী অপৌরাণিক হলেও এদের ভেতরে যে মাঙ্গলিক প্রাণশক্তি বর্তমান তা থেকে রস আহরণ করে ব্রতীগণ যে সভ্যতা রচনা করল তা থেকে হিন্দু ধর্মের কোন অংশ বাদ পড়েনি। প্রতিটি গ্রাম্য ব্রতের মধ্যে যেন একটি শক্তি নিহিত আছে যা থেকে সেবিকা তার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে। এ ব্রতগুলির মধ্যে বাঙালী জীবনের দ্বার খুলেছে। বাপ, ভাই, স্বামী ও শ্বশুরের বাণিজ্য যাত্রা তার জন্য মঙ্গল কামনা ব্রতগুলির উদ্দেশ্য বাণিজ্যে প্রাচীন বাংলা কতদূর অগ্রসর ছিল এবং কতখানি সাহসে তারা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্রত অবলম্বনের আশা ভরসা এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তের একটি বিষুবরেখা চলে গেছে। ব্রতের সঙ্গে লিপ্ত মানুষের সাধনা, শিল্প, নাট্য, উপাসনায় এবং ধর্ম আবরণের ভেতর থেকে বিকাশ লাভ করেছে। মানবের মনের স্বাভাবিক গতি যে যা কামনা করে থাকে সেরকম সিদ্ধি লাভ হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে লিখেছেন, আমাদের একটা ভুল ধারনা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্যে আধুনিক কিন্ডারগার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত—অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কতকটা তাই বটে কিন্তু আসল মেয়েলিব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেদেরও পূর্বেকার পুরুষদের তখনকার যখন শাস্ত্র হয়নি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান যে-গুলির নাম ব্রত।

এই সব ব্রতের মূলে কিসের প্রেরণা রয়েছে বলা শক্ত। মানুষের ধর্ম প্রবৃত্তি, না মানুষের শিল্প সৃষ্টির বেদনা থেকে জন্মলাভ করেছে এই ব্রতগুলি,

সেটা পরিষ্কার করে দেখার পূর্বে ব্রতগুলির সঙ্গে পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া দরকার।'

পাড়াগাঁয়ে প্রতিনিয়ত যে আদর্শ লৌকিক ব্রতের মধ্যে থেকে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে বাঙালী ঘরের শোক আনন্দের কথা প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করছে। বাংলা থেকে খাঁটি শিল্প এবং ব্রতের আলোক রশ্মি সম্পাৎ করছে। আর্য এবং অনার্য এই দুজনের প্রার্থনা ধন, স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন প্রভৃতি পার্থিব জিনিষ চেয়েছে। সাধারণ লোক চায় পেট ভরে খেতে, সুন্দর আবাসে থাকতে এবং মোটা কাপড় পড়তে। একটির জন্য আজীবনকাল যুদ্ধ করে আসছে, কিন্তু সমস্যা সমাধান দূরে থাকুক কেবলই সংগ্রাম করে আসছে। শান্তির পাত্র শয্যা তাই মনে হয় ব্রত উদ্‌যাপন শেষ হয়নি।

মুসলমান বাংলায় একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করলেও কিন্তু দুজনকার মধ্যে বিরাট ব্যবধান থেকে গেছে। বাংলার জনগণেরা ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হয়েছিল। মুসলমান অর্থে 'ভক্ত' কিন্তু এর মধ্যে পরিবর্তিত হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তফাৎ থাকলেও মানুষের মধ্যে একপ্রাণ এবং একই মাটিতে জন্ম। দুজনের ভেতর ধর্মের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাব কখনও কখনও একীভূত হয়ে একই কৃষ্টিকে অবলম্বন করে আত্মপ্রচারের সুযোগ লাভ করেছিল। ভারতে মুসলমান ধর্ম হিন্দুর উদারতায় নিজের প্রাণশক্তিকে সতেজ করেছে। হিন্দু কখনও বাঁধা দেয়নি সে স্থানে যে কোন ধর্মের মহত্ব, উদারতা আত্মত্যাগ এবং মহৎ স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছে সে ধর্মকে হিন্দু আপনজন করে নিয়েছে। গুরুর এ দুই জাতি দীক্ষা নিয়েছে। উভয়ের সাধক সম্প্রদায় এ জায়গায় একটি বিরাট আত্মার সঙ্গে সংযোগ হয়েছে। ভক্তিতে প্রেমে বাংলার জনপদ ভরপুর। আজ এ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। দুজনই নিজেদের জিদ বজাই করবার জন্য হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান নিয়ে একটি বৈষম্য দেখা দিয়েছে। যদি এ থেকে দুজনে পরস্পরে নিজ নিজ উন্নতি সাধন করতে পারে ভাল নতুবা দুজনকার সংস্কৃতি চিরকাল অস্তমিত হয়ে যাবে।

বাংলার বৈষ্ণব সাধকগণ

বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতা বলতে গেলে প্রথমেই বৈষ্ণব যুগকে মনে পড়ে। যদিও পূর্বে শাক্ত ও বৌদ্ধ প্রভাবে বাংলা দেশকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু ক্রমশঃই তার ভাঙ্গন ধরল উচ্ছৃংখলতার জন্যে। অন্ধকারের পর আলো দেখা দিল। পূর্ব আকাশ থেকে কণক রবি উঠল। বাংলার দিকে দিকে পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা হল। অহিংসার বাণী চারদিকে উদ্ভাসিত হল। জাতি জাতিতে বিভেদ, হিংসা, দ্বেষ সব ভুলে গিয়ে মানুষ এক নব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের সন্ধান পেল। বাংলার দিকে দিকে পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা হল। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতি সকলেই জীবে প্রেম ও অহিংসা পরম ধর্ম বলে জানল। তার মধ্যে খুঁজে পেল জীবনের পরপারের সন্ধান। জ্যোতির্ময় ঈশ্বরকে খুঁজবার জন্যে বৌদ্ধ ও শাক্তের মত কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন হল না। সংসারে ভগবানই একমাত্র তা খুঁজে পেল বাংলার বৈষ্ণব সাধকগণ। বৈষ্ণবদেব ধর্ম 'জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন'।

মানুষ পৃথিবীতে কেবল সহযোগিতা, সহায়তা ও সেবা করবার জন্যে জন্ম গ্রহণ করেছে। আমরা একলা এসেছি, একলা যাব কিছুই সংগে নিয়ে যাব না কেবল পৃথিবীতে রেখে যাব প্রেম। 'বৈষ্ণব ধর্মের এই হল মূল মন্ত্র'। তাছাড়া বৈষ্ণবগণ 'অহম' বা আমিত্ব ত্যাগ করে নিরহংকার কাজকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। মনের মধ্যে কোন বাসনা রেখে ঈশ্বরকে আরাধনা করা মানে আত্মাকে প্রবঞ্চনা করা হয়। তাই ভগবানের চরণে আত্মবলি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মোহ ও মাৎসর্যকে বলি দিলে তবেই প্রকৃত বৈষ্ণব হতে পারবে। বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ প্রেমের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে তাঁরা রাধাভাবে পূজা করে নিজেকে ধন্য বলে মনে করেন। এর মধ্যে কোন স্পৃহা থাকে না। সতীর মত পতির ওপর প্রেম, এই হল বৈষ্ণব সাধনার মূল কথা। তাঁরা তাঁদের প্রাণনাথের কাছে কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাই তাঁরা বলেন হে জগদীশ 'আমি ধন, জন বা কবিত্ব শক্তি এ কিছুই চাই না। জন্ম জন্মান্তরে যেন ঈশ্বরের প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি জন্মে, আমায় এই আশীর্বাদ কর।' এই আদর্শ বাংলায় শোনান প্রথমে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্য। তাঁর প্রেমে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে মিলন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা বাংলায় নব যুগের সৃষ্টি করেছিল। এই অপূর্ব মৈত্রী বাংলার জনপদে আর কোন কালে শোনা যায়নি। কৃষ্ণনাম কীর্তন শ্রীচৈতন্যের নব অবদান। অধরে অশ্রু

ধারা বইতে থাকে, পুলকে শরীর রোমাঞ্চ হয় ও মনের মধ্যে অপূর্ব-রূপ দেখতে থাকেন। তাঁর অসাধারণ ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ কীর্তনের মাঝে দেখা দিত। শ্রীচৈতন্য কখন কখন পুলকে পতিত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন। এক অপূর্ব ভাব ও ভক্তি এই দুই এর সমন্বয় তাঁর মধ্যে দেখা দিত। আষাঢ় মাসে একদিন কীর্তন করবার সময় শ্রীচৈতন্যদেবের পায়ে ইটের আঘাতে ক্ষত হয়। দু এক-দিনের মধ্যে বেদনা বেড়ে যায়। শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হলেন এবং সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন আট চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর তিরোভাব হলো। ১৪৫৫ শকাব্দ বা জুলাই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ বৈষ্ণবদের কাছে স্মরণীয় দিন। বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবকে পূর্ণব্রহ্ম এবং বিষ্ণুর অবতার বলে বিশ্বাস করেন। চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বললে তিনি রাগ করতেন। তাঁর শিষ্যরা বলে গেছেন, 'প্রভু কহে আমি মানুষ আশ্রম সন্ন্যাসী।' বৈষ্ণবদেরকে তৃণের মত নীচ ও তরুর মত সহ্য করতে উপদেশ দিয়ে ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবদের সাধন স্তর ভাগ করে দিয়ে ছিলেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভগবানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ ভক্তি এবং তৃষ্ণা ত্যাগই এই রসের উপাদান। এই পাঁচটি রসের সাধনা করলে সে সর্বজীবে ভগবান দেখে। তাঁর শেষ বাণী—হরিনাম সংকীর্তন একমাত্র মুক্তির উপায়।

তাঁর পার্শ্বদগণের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, উদ্ধারন দত্ত, নরোত্তম দাস, যবন হরিদাস, নরহরি, শ্রীনিবাস প্রভৃতি আচার্যগণ বৈষ্ণব সাধনা দ্বারা সুপ্ত পৃথিবীকে জাগ্রত করেছেন। তাঁদের অমূল্য দর্শন গ্রন্থরাশি আজও জ্ঞান জগতে অমূল্য সম্পদ। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর তাঁর জীবনী ও প্রচারিত ভক্তিবাদ জীবগোস্বামী বিশ্লেষণ করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমংগল বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত। কৃষ্ণ দাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত। লোচনদাসের চৈতন্য মংগল বাংলার কৃষ্টি ও সমৃদ্ধি প্রচার করছে। বাংলার বৈষ্ণবকুলকে রূপে, রসে ও গন্ধে ভরপুর করেছিলেন বাংলার সাধকগণ। তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, লোচনদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচিত গীতের সুধারাশি পামর ও অপামরের কানে শান্তি সুধা বর্ষন করে। সকলেই সমস্বরে হরি গুণ গান করে গেছে। মৈথিলী পদ মুখস্ত করে রাখতেন তাই আমরা তাদের রচিত পদাবলীতে মৈথিলী প্রভাব দেখতে পাই। তাঁদের রচিত পদ শ্রুতি মধুর ও ভাববিন্যাসে ভরপুর।

চৈতন্য মহাপ্রভুর নব অবদান কীর্তন দ্বার ১৬ শতাব্দীতে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর নিতাই জন সাধারণকে অলৌকিক জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর আগে কেবল উচ্চ ও মার্গ সঙ্গীতের চর্চা হত। তা কেবল আনন্দ বর্ধন ছাড়া আর অন্য কোন কাজ করত না। মানুষ ঐ সঙ্গীত করতে করতে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলল এক নিরানন্দ যবনিকার অন্তরালে। বাংলার বৈঠকী মজলিসে কবির গান, জারি, সারি প্রভৃতি লোকসঙ্গীত শোনা যেত। এতে তেমন প্রাণের দরদ বা সংস্পর্শ ছিল না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নব চেতনার সঞ্চার হল। ১৭শ খৃষ্টাব্দে খেতুড়ি মেলায় চৈতন্যযুগের নব আন্দোলন সৃষ্টি হলো। শ্রীখোল ও করতাল ও সাঁগা সহযোগে লীলা কীর্তন ধনী দরিদ্র সকলের প্রাণে ভক্তির সঞ্চার করল। বাংলার কীর্তন প্রধানত কৃষ্ণ ও রাধাকে অবলম্বন করে রচিত। বৈষ্ণবেরা রাধাভাবে কৃষ্ণের আরাধনাকে উচ্চ আসন দিয়েছেন। অধুনা বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে গৌর নিতাইকে নিয়ে বহু গ্রাম্য বৈষ্ণব কবি গান রচনা করেছেন। ভিখারীর ভিক্ষা করে 'জয়নিতাই' বলে। প্রতি বৈষ্ণব সাধকের মুখে 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম' শুনে পাপী তাপী শত জন্মের পাপ ক্ষয় হয় বলে মনে করে। তাই এখনও দরবিগলিত নেত্রে লোক কবি গেয়ে যায় :

কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক মানুষ যে জন হয়
তার চিহ্ন একটি আছে বটে, নয়ন দেখলে জানা যায়।
কৃষ্ণ দুঃখী, কৃষ্ণ সুখী, কৃষ্ণ ভক্ত মানুষ দেখি,
কৃষ্ণ কথা বলাবলি করে সর্ব্বদায়।
জলে কৃষ্ণ, স্থলে কৃষ্ণ, গগন মণ্ডলে কৃষ্ণ
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ, এ দেহে হয় উদয়।
জানে না সে অন্য কথা সর্ব্বদাই কৃষ্ণ কথা,
কৃষ্ণ কথা করে লতা, কৃষ্ণ-গুণ গায়।
কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গ করি। বেড়ায় যেন পাগল প্রায়।
কবে হবে আশা পূর্ণ, সংসার হেরি শূন্য।
সার করেছি, শ্রীচৈতন্য, নন্দের নন্দলাল।
গোঁসাই অটল-চাঁদ বলে। যে ভাব আছে সাধুর কাছে,
সে ভাব কি তুই পারিবি পাগল
এ ছেলের হাতের মোয়া নয়।

প্রাচীন বাংলা বৌদ্ধ সাহিত্য

প্রাচীন বাংলা বৌদ্ধ সাহিত্য নেপালের গ্রন্থশালা থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উদ্ধার করে আমাদের দৃষ্টিগোচর করেন। বাংলা ভাষা যে প্রাচীনকালে ছিল এবং তার মধ্যে যে সাহিত্য ছিল এর আগে কেহই জানতেন না। হিন্দুযুগে রামায়ণ ও মহাভারত এ দুখানি অমর কাব্য সংস্কৃতে লিখিত হয়েছিল। বুদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মী এবং নেওয়ারী এ দুটি অক্ষর অবলম্বন করে যে ভাষা গড়ে উঠেছিল তা আমরা অশোকের শিলালিপি ও বৌদ্ধ রাজার তাম্র ফলকে ও মুদ্রাতে প্রমাণ পেয়েছি। বৌদ্ধ শাসন ফলকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা হয়েছিল। ব্রাহ্মী থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন বর্তমান বাংলা অক্ষরের জন্ম হয়েছে। নেওয়ারী অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগরী অক্ষরের বিশেষ মিল দেখা যায়। বুদ্ধের ধর্মের প্লাবনে ভারতে দুটি রকমের অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কৃত হিন্দুদের এবং নেওয়ারী ও পালি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য। এ দুটি অক্ষর অবলম্বন করে ভারতে কত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল তার শেষ নেই। ভারতে সংস্কৃত সাহিত্য কেবল গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল। নেওয়ারী ও ব্রাহ্মী অক্ষরে যে সাহিত্য লিখিত হত তা কেবল সাধারণের পড়বার উপোযোগী করে লিখিত হত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধযুগে নতুন রূপ ধারণ করেছিল। এই সাধারণের ভাষা সহজভাবে ও স্বাবলীল গতিতে এবং ভঙ্গিমায় বাঙালীর তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সাহিত্য ধর্মের ওপর গড়ে উঠেছিল। হিন্দুরা যেমন গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, বেদ ও পুরাণের মধ্যে জীবের মুক্তির পথ দেখতে পায় সেরকম বৌদ্ধগণ বজ্রযান ও কালচক্রযানের দ্বারা পথ অনুসন্ধান করতে পারে। তাই অশ্বঘোষ বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন—

প্রজ্ঞাম্বুবেসাং স্থির শীলবপ্রাং সমাধি শীতাঃ ব্রতচক্রবাকাং।
সস্যোত্তমাং ধর্ম্মনদীং প্রবৃত্তাং তৃষ্ণাদিতঃ পাস্যাতি জীবলোকঃ ॥

অর্থাৎ তৃষিত জীবলোক এই উত্তমা ধর্ম নদীয় জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। প্রজ্ঞাস্রোতে এ নদী বেগবতী, স্থির বিনয় ব্যবহারই এই নদীর তটবে

দৃঢ় ও সমাধি এ'র জলকে শীতল করছে। আর এই উত্তমা নদীর জলে ব্রতচারী চক্রবাকেরা খেলা করছে।

জীবনের মুক্তি অনুসন্ধানে শাক্যসিংহ সংসার ত্যাগ করে এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে এই ধর্ম যাতে বিস্তার লাভ করে সেজন্য সহজযানের সৃষ্টি করলেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীরা নানা কৃচ্ছ্র সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এরা যে ভাষায় তাঁদের মত ও পথ সাধারণ লোকদের দেখিয়েছিলেন তা ক্রমশঃ এতই সহজ হয়ে গিয়েছিল যে সেকালের সকল লোকেদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধকাহিনী বিস্তার লাভ করল। এই সাধারণ লোকেদের জন্য যে শাস্ত্র লিখিত হয়েছিল তা সহজযানের শাস্ত্র। 'বজ্রযান ও কালচক্রযানের' শাস্ত্র সংস্কৃতে আর সহজযানের শাস্ত্র অপভ্রংশে লেখা হয়েছিল। এই অপভ্রংশ শাস্ত্রের রচয়িতারা ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। তাঁদের ভেতর সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নুপাদ ও তিল্লোপাদের লেখা বেশী পাওয়া গেছে। তাঁদের ভাষাও প্রাচীন, এর ভেতর বড় পার্থক্য নেই, তাই তাঁদের লেখা বইগুলি বাংলাভাষার আলোচনার জন্য খুব মূল্যবান। প্রাচীন ছন্দে তাঁরা যে সব নতুন সুর সংযোগ করলেন তারই প্রভাবে প্রাচীন বাংলা ও হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠেল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবীর প্রভৃতির ভেতর এই প্রাচীন সহজসিদ্ধদের লেখার ভাব ও রূপ আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এই ভাষা সাধারণ লোকেদের মধ্যে যখন সুবিস্তৃত হল এবং প্রসার লাভ করল তখন তাদের সাহিত্য বুঝতে সহজযানের প্রয়োজনের অপেক্ষা লোকযানের বা ফোকলোরের প্রয়োজন অধিকতর হতে লাগল। বৌদ্ধরা বুঝেছিলেন সাধারণ লোকেদের জ্ঞান ও উচ্চস্তরের জ্ঞানী ও বিদ্বানের মত নয়, তারা জটিল ব্যাকরণবহুল সংস্কৃত ভাষা শিখতে পারবে না, সেজন্য তাঁরা পালি, প্রাকৃত, নেওয়ারী প্রভৃতি সহজবোধ্য ভাষার সাহায্যে তাঁদের মত ও পথ বুঝাতে লাগলেন।

সহজযানের প্রাচীন শাস্ত্র বেশীর ভাগ তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত আছে। কয়েকখানি মূলগ্রন্থ নেপাল থেকে আবিস্কৃত হয়েছে ও প্রকাশিত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রাচীন বৌদ্ধগানগুলি 'চর্যাপদ' নামে প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি বৌদ্ধ, কাহ্ন, সরহ, লুই প্রভৃতি আচার্যগণ কতৃক লিপিবদ্ধ। এ'রা তিব্বতী সাহিত্যে সিদ্ধাচার্য নামে উল্লিখিত হয়েছেন। এই চর্যাপদগুলি লুই ও অতিসার দ্বারাই সাধারণ লোকেদের জন্য লিখিত হয়েছিল। শাস্ত্রী

মহাশয় যে পুঁথি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি অনুমান করেন নেওয়ারী অক্ষরে বাংলা ভাষার পুঁথি সম্ভবতঃ এই প্রথম। এই চর্যাপদগুলি খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতকে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল। তখন বহু বাঙালী বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরাই এই চর্যাগুলি রচনা করতেন। সেই রচয়িতাদের মধ্যে অনেকের নাম আজও পাওয়া যায়। যেমন দীপংকর, শ্রীজ্ঞান, মহীধর প্রভৃতি। এ সকল বৌদ্ধদেরকে সিদ্ধাচার্য বলা হত। তাঁরা চর্যা ভিন্ন দোঁহা রচনা করতেন। এছারা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচনা করতেন। গাথা রচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় একে 'গাথা ভাষাই' বলেছেন। সোনার একে মিশ্র সংস্কৃত বলেছিলেন। ঐ ভাষায় যে বহুদিন পর্যন্ত গাথা রচনা হয়েছিল, একথা কিন্তু কেউ জানতেন না। 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' রত্ন সঞ্চয়গাথা খৃষ্টীয় অন্তত ছয়শতকে লেখা হয়। কারণ পাঁচ শতকের পূর্বে 'শতসাহস্রিকাই' ছিল কিনা সন্দেহ। এই ভাষা ক্রমে চলতি ভাষার সঙ্গে মিশে নরম হয়ে এসেছে এবং অনেকটা চলতি ভাষার মতনই দাঁড়িয়েছে।

বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্যে চর্যাচর্য যে স্থান অধিকার করে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য প্রচার করছে অনেক বৌদ্ধ বিদ্বেষীরা অস্বীকার করলে-ও এ কম গৌরবের বিষয় নয়। চর্যাচর্য বিনিশ্চয় গ্রন্থে জকর্ণব অধ্যায়ে আছে—

'সহজ এক পর আথেতোহি ফুল্ল কাহ্ন পরজই
সাম্ব আগম বহু পঠই বট কিংপিন জীনই।

শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃতে অর্থ করেছেন—

'সহজমেকং পরং তত্ত্বমস্তি' তচ্চ কৃষ্ণ বজ্রঃ পরং জানাতি। শাস্ত্রানি তর্কাদীনি আগমা ক্রিয়া চর্য্যাদিকানি বহুবিধানি পঠতি পঠয়তি শৃনোতি স্রাবয়তি চ কিমপি (ন জানতি) বজ্রয়ানাদিনিরুত্তর মন্ত্রনয় রহসঃ বহির্মুখহাক্য পুনমৎসদৃশঃ পরং জানাতীতার্থঃ

সিদ্ধাচার্যেরা এই গান রচনা করতেন। লুই, কুড়িজন সিদ্ধাচার্যদের গুরু কিংবা এঁদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তেঙ্গুর সংগ্রহাবলীর মধ্যে দেখা যায়— লুই এবং অতিসা এ দুজন 'অভিসময়বিভঙ্গ' বৌদ্ধ তন্ত্র সংস্কৃতে রচনা করেন। অতিসা ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে আহুত হয়েছিলেন। লুই এবং অতিসা দুজনই বাঙালী। এখনও পশ্চিমবঙ্গে লুই পন্থীরা বর্তমান আছেন এবং

আদি লুইকে পূজা করে থাকেন। এই চর্যাপদগুলি ৮০০ খৃষ্টাব্দে মীননাথ কর্তৃক সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বাংলায় লিখিত হয়েছিল।

ধর্মপালের রাজত্বকালে বাংলার আদিম (Proto-Bengali) অক্ষর ৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রচলন ছিল। পরে যখন পালরাজত্ব সম্পূর্ণভাবে বাংলায় স্থাপিত হল তখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মন্য ধর্মের সহযোগিতায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি হল।

"Emulating the 'vernacular' literature in Western Apabhransa which had doubtless already established itself in Bengali a literary language for mass appeal and taking note of such meagre Folk Literature as may have existed orally in the vernacular dialects of Bengal, Buddhist preachers of the Sahaja school were probably the first to begin compose padas or short Poems of four to half-a-dorzen rimed complete in the Proto-Bengali Vernacular.

বৌদ্ধ সাহিত্য বহু অপভ্রংশ অক্ষরে সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা লেখা হত। জগতে তা নতুন এক কৃষ্টির পথ প্রথমে খুলে দিয়েছিল। মানবের সহজ চিন্তাধারার সংগে এমন সামঞ্জস্যময় সাহিত্য আর অন্য সাহিত্যে নেই। সমস্ত মনের অভিব্যক্তি সুবিনস্ত্য কবিত্বময় কাহিনী ও ছন্দ অবলম্বন করে যে সকল সিদ্ধাচার্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লুইপা এবং কাহ্নপা বা কৃষ্ণপদ প্রধান। বর্তমান জলধারী পদ তার ডাক-নাম। হরি বা গোপীচন্দ্র রাজার গান লিখে সমগ্র ভারতে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তা আসাম, চট্টগ্রাম, পাঞ্জাব, মারাঠা প্রভৃতি দেশে বাংলা সাহিত্য প্রচার করেছে।

বাংলা বৌদ্ধ সাহিত্য আজ আমাদের কাছে প্রচীন লোকসাহিত্যের অভাব মেটাবে। চর্যাপদ ছাড়া বাংলার বৌদ্ধদের রচিত বাংলা ভাষায় শূন্য পুরাণ রচিত হয়েছিল। এতে ধর্মঠাকুরের ও তাঁর আচরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁদের পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। বাংলার শূন্যপুরাণকে 'রামাই পণ্ডিতের' রচনা বলে অনেকে মনে করেন। রামাই পণ্ডিতকে ধর্মপূজার প্রধান পুরোহিত। প্রায় সকলগুলি ধর্মমঙ্গল কাব্যে গ্রন্থাকারগণ অতি শ্রদ্ধার সংগে তাঁর উল্লেখ করেছেন। রামাই পণ্ডিত যে ধর্মপূজার প্রচলন করেন তা মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃত রূপ। ঐতিহাসিকগণের মতে বুদ্ধ ধর্ম, ও সংঘ এ ত্রিরত্নের

অন্তর্গত ধর্মই কালে ধর্মঠাকুর রূপে পরিণত হয়েছেন। রামাই পণ্ডিতের রচনায় কতকগুলি অংশ অতি প্রাচীন বাংলায় রচিত। তার অনেকাংশ দুর্বোধ্য।

মানিকচন্দ্র রাজার গান এবং ময়নামতীর গান ১১-১২ শতকে বাংলা বৌদ্ধ সাহিত্যে এক নব যুগ সৃষ্টি করেছিল। তারপরে খনার বচন বা ডাক এখনও জনসমাজে প্রচুরভাবে চলিত আছে। এতে এমন সদুপদেশ আছে এবং ছড়ার মধ্যে এমন চমৎকার মার্জিত ভাব আছে যা অন্য দেশের ছড়ায় নেই। ডাক ও খনার বচনে কৃষকদের সম্বন্ধে উপদেশই বেশী। বঙ্গীয় কৃষকদের এগুলি প্রাচীনতম ছড়া এবং তাদের নিজস্ব।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জর্জ গ্রীয়রসন ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের গান বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করে বিদ্বদ-সমাজের দৃষ্টি গোচরে আনেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন, গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ে সবচেয়ে পুরানো রচনা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে নেপালে রচিত একটি নাট্য পালা, 'গোপী-চন্দ্র-নাটক'। এই ভাষা-নাটকটি লেখা হইয়াছিল নেপাল-পাটনের রাজা সিদ্ধি নর সিংহদেবের রাজ্যকালে (১৬২০-৫৭) নাটকের মূল অংশ বাঙ্গালায় লেখা। আর অভিনয়ের নির্দ্দেশ এবং গদ্য অংশ নেওয়ারীতে লেখা। বাঙ্গালা-অংশ উদ্ধৃত করিয়া নাটক-কাহিনীর ধারাবাহিক পরিচয় দিতেছি।

প্রথমে, রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার দুই মাহষী উদনা-পদুমা অন্তঃপুরে কথোপকথন করিতেছেন এই দৃশ্যের অবতারণা।

বাপ রূপচন্দ্র হে ময়নাবতী মাত্র
যার কোখি জনমিয়া বোলাইল রাত্র
আইল হে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের অধিপতি
উদনা পিদুমা লৈয়া কেলি করন্তি।

পরের দৃশ্যে রাজ-শ্যালক (?) বঙ্গকুমারের সহিত খেতু পাত্র। কালিঙ্গা কোটাল ও ডাগী খেলের ষড়যন্ত্র। গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে বঙ্গকুমার উৎপাত আরম্ভ করিলে খেতু পাত্র ও কালিঙ্গা কোটালের সঙ্গে রাজা নব লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিলেন বঙ্গকুমারকে বিনাশ করিতে, খেতু কিন্তু বঙ্গকুমারের সহিত যোগ দিয়া রাজারই সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিল। তাহাতে রাজা খেতুর উপর বধ দণ্ড আদেশ করিলে রাণীরা কালিঙ্গা কোটালের নিকট খেতুর প্রাণ ভিক্ষা করিল।

শুনহ কলিঙ্গা আমার বচনে
একহাল প্রাণ রাখো খেতু দেও দানে ।
না মারহ কোটবাল না মার পরাণে
দিবো তোরে কোটবাল আমোল রতনে ।

রাণীদের কথায় কোটাল খেতুকে ছাড়িয়া দিয়া ছাগলের রক্ত লইয়া রাজাকে দেখাইল খেতুর রক্ত বলিয়া ।

এমন সময় রাণী ময়নাবতী আসিয়া পুত্রকে বলিলেন, তাহার শুভ হইবে না । তখন গোবিন্দচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ময়নাবতী, লোক পাঠাইয়া খুঁজিয়া পরমসিদ্ধ যোগী আনাও । তাহার উপদেশে তুমি অমর হইতে পারিবে । রাজা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আহা আমি নিষ্ঠুর হইয়া খেতুকে বধ করিলাম । এখন পাঠাই কাহাকে । ময়নাবতী বলিলেন, বধূরা খেতুকে লুকাইয়া রাখিয়াছে । রাজা খেতুকে সমাদর করিয়া সিদ্ধ-যোগীর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন । খেতু সিদ্ধ-যোগী জালন্ধরির সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে সম্মত করিয়া রাজসভায় লইয়া আসিল । যোগীকে বহু প্রকারে পরীক্ষা করিয়া শেষে রাজা যোগী হইতে রাজি হইলেন । জালন্ধরি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন । শেষে ঠিক হইল । তিনবার পাশা খেলা হইবে । তাহাতে যোগী হারিলে রাজার ভৃত্য হইবেন আর রাজা হারিলে যোগীর ভৃত্য হইবেন ।"

"রাজা হারিয়া গিয়া যোগী হইতে চাহিলেন । সন্ন্যাসের কষ্ট বর্ণনা করিয়া জালন্ধরি রাজার দৃঢ়চিত্ততা পরীক্ষা করিয়া তত্ত্ব কথা বলিতে লাগিলেন । শেষে তাঁহাকে রাজ ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিতে বলিলেন ।"

"তাহার পর জালন্ধরি যোগীচক্র করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য ইত্যাদি ভোজন করিলেন । তাহার পর উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যোগীদিগকে বিদায় দেওয়া হইলে জালন্ধরি শিঙ্গা বাজাইয়া রাজাকে আহ্বান করিলেন । শিঙ্গাধ্বনি শুনিয়া রাজা অন্তঃপুর হইতে চলিয়া আসিলেন । গুরুশিষ্যে তত্ত্ব কথা হইতে লাগিল । এমন সময় দুই রাণী আসিয়া রাজাকে ভুলাইয়াছে বলিয়া যোগীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, যোগীও উত্তর দিতে লাগিলেন । শেষে না পারিয়া উঠিয়া তাহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবার ভয় দেখাইলেন । রাজা তখন রাণীদের বুঝাতে চেষ্টা করিলেন ।"

রাণীরা তখন যোগীকে অনুনয় করিতে লাগিল ।

যোগী বলিলেন, বেশ আমি চলিলাম ; আমি তো নিজে আসি নাই, রাজাই ডাকিয়া আনিয়াছিল। যোগীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রাণী দুইজনকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাণীরা রাজাকে বলিল, তুমি ঘরে বসিয়া থাক। আমরা তোমার হইয়া ভিক্ষা মাগিব ঃ

প্রভাবে বিহান হৈলে ঘৃত অন্ন যোগাইব
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিব পানি
সুন্নিবাকে শয্যা দিব এ খাট পালঙ্কে রে
যোগী হৈয়া কোন সুখ জানি

রাজা বলিলেন, এ সব বস্তু আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দাও, আমার ও-সবে প্রয়োজন নাই।

রাণীরা বলিল, তোমার বড় কষ্ট হইবে।

যোগী তখন নারী নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহার পর গোরক্ষনাথের ছড়া বলিতে লাগিলেন। যোগী বলিলেন, রাজা, তুমি দুটি নারী ত্যাগ করিতে পারিতেছ না। আর আমি দিল্লীর রাজা ছিলাম। সাতশত রাণীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া তখন অবশেষে জালন্ধরি রাজাকে বলিলেন, তোমার যদি যথার্থই যোগী হইবার বাসনা হইয়া থাকে তবে উদনা-পদুমাকে মাতৃ সম্বোধন কর রাজা তাহাই করিলেন। রাণীরা সকাতরে জালন্ধরির কাছে স্বামি-দান চাহিতে লাগিলে যোগী বলিলেন, আমি কি বলিব ? তখন উদনা-পদুমা শোক ভরে প্রাণত্যাগ করিল, রাজাকে স্ত্রী বধপাতক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যোগী তাহাদিগকে জীয়াইয়া দিলেন। তাহার পর রাজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, এই কাহিনী ভারতবর্ষের যে-যে অঞ্চলে প্রচলিত আছে সর্ব্বত্রই গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের রাজা বলিয়া। সুতরাং বাঙ্গালা দেশেই যে এই কাহিনীর উদ্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশের এবং পূর্ব্বভারতের অন্য প্রান্তের নাথ-পন্থী যোগীরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের তরুণ বাঙ্গালী রাজপুত্রের এই সকরুণ গাথা গাহিয়া বেড়াইত। এখনও বাঙ্গলায় বিহারে উত্তর পশ্চিম-প্রদেশে পাঞ্জাবে সিন্ধুদেশে মহারাষ্ট্রে মধ্যভারতে ও উড়িষ্যায় গোরক্ষ-পন্থী ভিখারীরা একতারা-গোপীযন্ত্র-সারেঙ সহযোগে গোবিন্দ-চন্দ্রের গানে উপখ্যানের সামান্য কিছু রূপভেদ দেখা যায়। তবে গল্পের কাঠামো মোটামুটি একই। অতিরিক্ত শুধু ভক্তু হরির ভূমিকা।

গোবিন্দচন্দ্রের "পাটিকা" ভূবন প্রাচীন বাঙ্গলার 'পট্টিকার জনপদ' আধুনিক ত্রিপুরা অঞ্চল। ইহা বৌদ্ধ তান্ত্রিক পূজার একটি প্রধান পীঠস্থান ছিল।

এই গানে কোন ঐতিহাসিকতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই ডঃ সেন বলেছেন, স্বাধীন প্রমাণ ব্যতিরেকে ময়নামতী-মানিকচন্দ্র-গোবিন্দচন্দ্রের ভূমিকা ঐতিহাসিক বলা চলে না।

বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবলম্বন ছিল সংস্কৃত। কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ধার ধারতেন না তাঁরা হলেন তান্ত্রিক বজ্রাচার্য্য ও শৈবনাথাচার্য্য। তাই দেখা যায় বাংলাদেশে সাধারণ লোকদের দ্বারা শিব গান গীত হত। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিব পূজা করতেন। এই শিবের স্থান বুদ্ধ অপেক্ষা নিম্নে। বৌদ্ধ যুগের শিব কৃষকদের দেবতা। এই কৃষক শিবের গান বাংলাদেশে এরকম প্রচলন ছিল। পরবর্তী হিন্দু কবিগন শিব চরিত্রের এই ভাষা একেবারে বর্জন করতে পারেননি। এই গানগুলি ১০-১১ শতকে গীত হত। এর মধ্যে তেমন ভাষার ঝংকার না থাকলেও ভাবের ও ভক্তির চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। কৃষকেরা তাদের কামনা এই শিবের কাছ থেকে চাইত। তাদের ধারণা ছিল শিব যখন তাদের দেবতা তখন তিনিও কৃষক তাতে কোন ভুল নেই। শিবের গানে দেখা যায় কৃষকের অজ্ঞায় শিব চাষ করছেন।

আমার বচনে গোসাঞিঃ তুহ্মি চষ চাষ
কখন অন্ন হএ গোসাঞিঃ কখন উপবাস।

পৃথিবীর সকল কৃষকদের মধ্যে Harvest Diety আছে। বাংলার হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মেশামিশির ফলে বুদ্ধ, শিব প্রভৃতি দেবতাদের লোকেরা আপন করে নিয়েছিল। এতে কৃষকদের ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভীরুতা যে বিশেষ প্রবল ছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙালী বৌদ্ধদের অনন্য সাধারণ অবদান। তা কিঞ্চিৎ হলেও এটি বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্য প্রমাণ করে। এ প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। কেবল যে বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্যিকরা লোকসাহিত্যে বা সহজযানের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়। তাদের ভেতর বড় বড় পন্ডিতগণ আধ্যাত্মিক ও ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এদের মধ্যে অতিশ, দীপংকর এবং শীলভদ্রের নাম সমগ্র বৌদ্ধ জগতে এমন কি জগতের বিদ্বান সমাজে বিশেষ পরিচিত। শান্ত রক্ষিত যিনি নালন্দায় প্রধান পুরোহিত ছিলেন তিনিও গৌড়বাসী ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের কয়েক শতাব্দী পর একদল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করেন। এই প্রচারগুলি হীনযান পুঁথিতে ১১ শতাব্দীতে সংকলিত হয়েছিল।

বাংলার লোক নৃত্য

নৃত্য বৈদিক যুগের আগে থেকে আর্যেতর জনগনের মধ্যে প্রচলিত ছিল। গীতের মত নৃত্যও দুটি ভাগে বিভক্ত, মার্গ ও দেশী। মার্গ কেবলমাত্র উচ্চস্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু দেশী জনপ্রবাদ, লৌকিক বিশ্বাস এবং ধর্ম থেকে উৎপত্তি হয়েছে। মানবের মনে ভগবৎ চিন্তা ও সূক্ষ্ম জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা নৃত্যের দ্বারা সম্ভব হয় এই অনেকের বিশ্বাস। বাংলার লোকনৃত্য ধর্ম বহির্ভূত হয়নি বরং নৃত্য কলাবিদের অজ্ঞানে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য তিনটি এক সঙ্গে প্রবেশ করে উচ্চ কৃষ্টির পরিচয় দেয়। আবহমানকাল থেকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রত্যেক লোকের মনে এক নৃত্য ভাব নিয়ে এসেছে। তাঁর বাঁশীর ধ্বনি কানের ভেতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে সকল নরনারীকে আকুল করে তুলেছিল। বাংলার বার মাসে তের পার্বনে নৃত্যগীতের উৎসব হয়ে থাকে। মেয়েদের ব্রতে অনেক রকমের নৃত্যকলার সমাবেশ দেখা যায়। যদিও এসকল নৃত্যকলা ভারতীয় নাট্য থেকে বহুদূরে সরে আছে তাহলেও লোকনৃত্যের মধ্যে ধর্মাভাব এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ও শিবের প্রভাব সাধারণ উচ্চশ্রেণী নৃত্য-অনভিজ্ঞদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। কিন্তু এ নৃত্যগুলি ক্ষুদ্র আবেস্টনীর মধ্যে থেকে বিশেষ বেড়ে উঠতে পারে নি।

বাংলার দেশী নৃত্য যেমন ধর্মভাবে বিকাশ লাভ করেছিল সেরকম স্বাভাবিক নৃত্যও সাধারণ থোককে অনুপ্রাণিত করত। লোকনৃত্য বহু রকমের থাকলেও জনপ্রিয় নৃত্যের মধ্যে বেদে, রাসলীলা, সাঁপুড়ে, ঢপ, গাজন এবং মণিপুরীর নাম করা যেতে পারে। এই নৃত্যগুলির মধ্যে তাল, লয় এবং রসের সমাবেশ আছে। নৃত্যের ভেতর পায়ের ক্রিয়া কুশল বিশেষভাবে দেখান হয়। নৃত্য-বিদরা একে খুব উচ্চকলা বলে মনে করেন। বহু যুগের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-কলার বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু লোক-নৃত্য আবহমান কাল থেকে একই স্তরে চলে আসছে। লোক-নৃত্য থেকে অভিনয় অর্থাৎ যাত্রার উৎপত্তি হয়েছিল।

নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানতে হলে ছেলে ভুলান ছড়া বিশেষ ভাবে

পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। শিশু মায়ের কাছ থেকে নৃত্যের অ আ ক খ শিক্ষা করে ভবিষ্যতে নৃত্যজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে, মায়ের মনের আনন্দের উৎস শিশুর নৃত্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। শিশুর হাঁটবার সঙ্গে সঙ্গে মা তাকে নাচ করতে শেখায়। তার অঙ্গ সঞ্চালন মায়ের চোখে নৃত্য রূপে দেখা দেয়। শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ও মায়ের ইচ্ছা শক্তির ভেতরে শিশু নৃত্য করতে থাকে। মায়ের মনে শিশুর নৃত্য পটুতা এতই মুগ্ধ করে যে তা পৌরাণিক নৃত্য কলাকুশলবিদদের নৃত্য তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। শিশুর সঙ্গে জড়িত সারা বিশ্বপ্রকৃতি মায়ের কাছে এক অপূর্ব আনন্দরস বলে মনে হয়। সে নিজে নাচতে না পারলেও নিজের ইচ্ছাশক্তিকে শিশুর ওপর দিয়ে চালিত করে। ভবিষ্যতের আশা তার প্রাণে দোলা দেয়। মা মুগ্ধ নেত্রে শিশুর অঙ্গচালনা দেখতে থাকে। মা তার শিশুকে গোঠের কৃষ্ণের মত নৃত্য করতে বলে—

একবার নাচো চাঁদের কোণা
আমি মুরলী বাঁধিয়ে দেব যত লাগে সোনা
আবার তোমার নাচন আমি জানি
জানে ব্রজাঙ্গনা।

শিশুকে মা গোপাল বলে মনে করে। তার স্নেহের রস নির্ঝরিণী গোপনে শিশুর ওপরে ঢেলে দেয়। চুম্বনে, দোলায় ও নৃত্যে তাকে তন্ময় করে তোলে। শিশুর হেলে দুলে দুর্বল পায়ের ওপর নির্ভর করে যে নৃত্য তা মা ছাড়া আর কারও ভাল লাগে না অর্থাৎ বাল্যরস গ্রহণ করবার শক্তি অপর কারও নেই। সেই নৃত্যের অপূর্ব তথ্য বলবার জন্য সে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুর অপূর্ব নৃত্য-মাধুর্য হৃদয়াঙ্গম করা কুট ও বিজ্ঞান কলা-কুশলবিদদের সাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে। স্নেহ-বীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব। মাতার স্নেহের চক্ষে নৃত্যলীলা বালক গোপালের মত লাগে। নৃত্যের আদিরস ভবিষ্যতে পুরুষ ও নারীর হৃদয়ে নানা ভাবে পরিস্ফুট হয়।

নৃত্য সম্ভবত পৌরাণিক দেবদেবীদের কাছ থেকে এসেছে। গীতের সঙ্গ নৃত্য নির্ঝরিনী রূপে প্রবাহিত হয়ে মানবের মনের নিভৃত সাধনাকে জাগরিত

করে। অলৌকিক জগতে শাস্ত মানবের ধমনীতে ক্রিয়া করতে থাকে। ভারতীয় সঙ্গীতে গীতের সঙ্গে নৃত্যের প্রক্রিয়া মানবের দেহমনকে তন্ময় করে দেয়। হিন্দুর দেবদেবীর মধ্যে সকলেই গীত ও নৃত্যের অনুরক্ত। তাই একটি গ্রাম্য ছড়ায় দেখা যায়—

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।

নৃত্যের নব প্রবাহ শ্রীবৃন্দাবনে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর ধ্বনিতে ব্রজধামের সহস্র সহস্র গোপিনীরা আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে তাঁর চারদিকে চক্রাকারে নাচত। বর্তমান ভারতীয় লোকনৃত্য প্রাচীন স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে। রাসলীলা, গন্ধর্ব ও অন্যান্য নৃত্যে কৃষ্ণলীলার সমাবেশ দেখা যায়। এ সকল নৃত্যের সঙ্গে ধর্মের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। এ স্থানে কৃষ্ণের নৃত্য অনুষ্ঠান যত প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি আর কোন পৌরাণিক নৃত্য জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

বাংলার লোকনৃত্যে পৌরাণিক ক্রিয়া কলাপ খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। কৃষ্ণযাত্রা, রামায়ণ ও মহাভারত এবং দেবদাসী নৃত্য বিশেষ ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বাঙালী যে নৃত্যরস বহু যুগপূর্ব থেকে আস্বাদন করছেন তা আজ নানা ভাবে বিভক্ত হয়ে নৃত্যশিল্পীদের হৃদয়ে পর্যবসিত হয়ে আছে। লোকগীতের সঙ্গে লোকনৃত্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। বাংলায় বহুকাল আগে মেয়েলী নৃত্য প্রচলিত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে আমরা দেখি যে চৈতন্যদেবের বিবাহের সময় পুরনারীরা গান গাইছে এবং নৃত্য করছে। বাংলার জনপদে যে সকল নৃত্য প্রচলিত আছে তা সকলই ধর্মের উৎস থেকে উদ্ভব হয়েছিল। বাঙালীর নাচ অপূর্ব প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মল্লনৃত্য রায়বেশে নাচ ও ব্রতনৃত্য। বাংলা দেশে বাউল, ফকির ও ভক্ত সাধুদের এবং গ্রামীণ জনগণেরা নিত্য জীবনে নানা উৎসবের মাঝে নৃত্য করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে 'চড়কনৃত্য' বীরভূমে প্রচলিত 'ভাদোর গান' সেই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণী লোকেদের মধ্যে প্রচলিত গান ও নাচ বাগদীরাই সাধারণতঃ এই উৎসবের উদ্যোগ-কারী। এ সম্বন্ধে কোন এক বিশিষ্ট গবেষক বলেছেন "They also parade the effigy of a female saint named Bhadu who is said to have been daughter of the Raja of Pachet and who died a kirgin for

good of the people. Her worship consists of songs and wild dances on which men and women and children taken part. After this all eat and make merry, dance and sing obscene songs and induige in orgies in which self respect and decencies are for-gotton. ভাদু গান নাচের মধ্যে শৃঙ্গার রসের আধিক্য থাকলেও এ একশ্রেণী লোকের নয়নতৃপ্ত ও মনোরঞ্জন করত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য বহু নৃত্যে 'Eat and be merry' খাও এবং আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হওয়া আমরা দেখতে পাই। সে দেশের শিক্ষিতরা যে দৃষ্টিকটু নৃত্য করে তাতে কেউ কিছু মনে করে না তবে আমরা অশিক্ষিত জনগণের নৃত্য উৎসবকে কেন অসভ্য বলব?

ভারতীয় নৃত্যকলা যদি সমগ্রভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে আমরা দেখব নৃত্যের উদ্ভব ও গতি ধর্মের ভেতর থেকে এসেছে। মানবের অন্তরের আধ্যাত্মিক ভাব নৃত্যের ভেতর থেকে স্ফুরণ হয়েছে। ডঃ আরনল্ড বাকে বলেছেন— "Indubitably, at least in India, the intoned word, either chanted or song, become the bearer of the highest, most elevated form of religion, which culminated in the liturgic music of the hymus of the Vedas. Instrumental music by itself was not such a powerful agent in India although we find its divine powers recognised in the voice of Krishna's flute. It was mostly in combination with dance that instrumental music kept its connection with religion in one of its oldest forms-namely that of bodily outstepping the bonds of human limitation."

যদিও গ্রামবাসীদের নৃত্য সাধারণত অশাস্ত্রীয় বলে ধরা হয় কিন্তু ঠিক সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখলে এ মোটেই অশাস্ত্রীয় বলে প্রতীয়মান হবে না। কারণ দেবদেবীদের ও হিন্দু শাস্ত্রের যাঁরা মূর্ত প্রতীক তাঁদের অনুকরনীয় নৃত্য কিভাবে অশাস্ত্রীয় বলে প্রতিপন্ন হবে? বাংলার বেদে, সাঁওতালী ও অন্যান্য আদিবাসীদের নৃত্য সংযোজিত হয়েছে।

বাংলার পল্লীনারীদের হৃদয়ে ব্রতকথা ঘিরে আছে। তা অবলম্বন করে তারা প্রতিমাসে যে আনন্দের ঢেউ তোলে তা নৃত্যজগতে এক নব পর্যায়ের সৃষ্টি

করেছে। বৈশাখের প্রথম থেকে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত নানা উৎসবে এবং নানা পর্বে গীত ও নৃত্যে পল্লীকুঞ্জ মুখরিত করে তোলে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার বলেন—'রূপকথা প্রভাত, পুষ্পের পূর্ণ ডালা; ব্রতকথা জল-শস্য-সজ্জা ধরিত্রী রসকথা নিত্যোৎসবময় ক্রীড়াক্ষেত্র। গীতকথা পূর্ণিমার আকাশ। স্তরে স্তরে পরদায় পরদায় ভাষা, কল্পনা সমুদয় ক্রমশঃ উঠেছে। তিনি বাঙালীর প্রাণে কেমন করে নিত্যপ্রবাহ এল এর চিত্র দেখিয়েছেন।

বাংলার লোকসংগীতে ভাদু ও টুসু গান

বালার লোক সংগীতে ভাদ, ও টুসু গান বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ভাদ্র মাসে ভাদু গানের সুরে পল্লীর কুটীরে চলতে থাকে ভাদুলী ব্রত আর ভাদু গান। আষাঢ় মাসে আউস ধান রোপন করবার পর আবার ভাদ্র মাসে আমন বপনের সময় আসে সমবেত ভাদু উৎসব। তখন সুরু হয় বাংলার শরৎ। বর্ষার পর শরৎ নিয়ে আগে স্নিগ্ধতা। হিমের পরশে সকল প্রাণে দেয় নতুন হিল্লোল তখন যেন শরৎদেবী পল্লী কুঠীরে প্লাবনের ভয়াবহ রূপ ত্যাগ করে দাঁড়ায় শান্ত শ্যামল শুভ্র বেশে। এই ভাদ্র মাসে ঘরে ঘরে সুরু হয় লক্ষ্মী পূজা আর ভাদ্রালী বা ভাদুলু ব্রত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার তাঁর ঠানদিদির থলে বা বাংলার ব্রতকথা গ্রন্থে ভাদুলীব্রতের যে কথা ও আলপনার ছবি এঁকেছেন তা অনবদ্য। তিনি ভাদুলীব্রত কেন করে তার ছোট্ট দুলাইন ছড়ায় ব্যক্ত করেছেন—

ভাদ্রে ভাদুলী—নদী বৃষ্টির জল।
ভাদুলী পূজলে হয় সুমঙ্গল ॥

ভাদুলী ব্রতে ব্রতনীরা গ্রাম্য হলেও এদের মধ্যে উচ্চস্তরের হিঁদুয়ানীর ছাপ বর্তমান। ব্রতের 'নিয়ম-সিয়ম' ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

এ ব্রতে লাগবে—এক জল—বৃষ্টির জল—আর জল—নদীর জল, একখানা পিঁড়ি। একগাজি পৈতা, একজোড়া পাকা তাল, একটা সিধা, একট পুঁটি মাছ এক কাঁধি কলা, কলাগাছের খোলের একটা নৌকা আর ফুল, চন্দন সিঁদুর আর আলপনার জন্য পিটুলী একটি পিঁড়িতে পিটুলী দিয়ে আঁকতে হবে জোড়া ছত্র মাথায় ভাদুলী ঠাকুরাণী জোড়া নৌকার উপর আলপনা আঁকার সুন্দর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'আঁকতে হবে, সাত সমুদ্র (তার এক সমুদ্র তো কেটে ইচ্ছ, আলিপনায় আঁকবে আর ছয় সমুদ্র) তের নদী; বড় এক নদী তার তের মুখ সমুদ্রের গায়ে গায়ে মিশিয়ে দিতে হবে। নদীর চড়া আঁকবে। তারপর আঁকবে বন, বাঘ, মোষ (মহিষ) কাক, বক, আর আঁকবে-কাঁটার পর্ব্বত, তালগাছ, তালগাছ বাবুই এর ভেলা আর ব্রতীর খাট (আসন) শাস্ত্রে আছে কিনা

সন্দেহ। এই ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে মন্ত্রও সৃষ্টি হয়েছে। অদ্ভুত এ মন্ত্রএ যেন বেদগানের মত

(১)

যেমন :—

নদি! নদি! কোথায় যাও
বাপ ভাইয়ের বার্ত্তা দাও,
নদি! নদি! কোথায় যাও ?
স্বামী শ্বশুরের বার্ত্তা দাও।
নদীর জল বৃষ্টির জল যে জল হও
আমার বাপ ভাইয়ের সম্বাদ দাও
সকলে ফুল নদীতে দাও।

(২)

কাঁটার পর্ব্বত সোনার চূড়া-উদয়গিরি।
বাপ ভাই গেছেন কোন্ ব্রজে ?
স্বামী শ্বশুর গেছেন কোন্ ব্রজে ?
তোমারে যে পূজলাম্ তাঁরা সুমঙ্গলে আসুন
আপন বাড়ী
তোমার হোক সোনার পিঁড়ি।

(৩)

বনের বাঘ বনের মোষ
তোমরা নিওনা আমার বাপ-ভাইয়ের দোষ
তাঁরা গেছেন এক পথে
ফিরে আসবেন আর এক পথে। ইত্যাদি

এই ব্রতের সমাপ্তে ব্রতীরা ভাদুলী দেবীর স্তুতী করে বলে :—

নমঃ নমঃ ভাদুলী দেবী ইন্দ্রের শাশুড়ী
বছর বছর রক্ষা করো ব্রতীর পুরী ॥

একমাস ধরে এ ব্রত চলে বর্ণ হিন্দুদের ঘরে ঘরে ঠিক ভাদুলী ব্রতের মত অপরদিকে শুরু হয় বাগদি, বাউরি, ডোম ও হাড়িদের ঘরে ঘরে ভাদু উৎসব। পশ্চিম বাংলার সীমান্তে মানভূম ও এবং বাঁকুড়া, বীরভূম বর্ধমানে এর আধিক্য

দেখা যায়। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ভাদু উৎসব পালন করে থাকেন।

এই ভাদু উৎসবের ব্রতীগণ ঠিক লক্ষ্মীর মূর্তির মত ভাদুরাণীর সোনালী রং এর মাটির মূর্তি তৈরী করে। এই মৃন্ময়ী মূর্তির এক হাতে থাকে মিঠাই এর মোন্ডা আর এক হাতে থাকে পান। তারা বাড়ী বাড়ী মূর্তিটিকে নিয়ে যায় আর ঢোলের বাদ্যের সংগে নাচতে থাকে। সারা ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা বেলায় গান নাচ চলে। এই সময়ে সুরু হয় আদিবাসীদের করম উৎসব। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বলেছেন "তখন পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিনী কুমারীদিগের কন্ঠনিসৃত ভাদু গানের ভিতর দিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-দক্ষিণ মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্দ্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা হিন্দু প্রভাব বশতঃ বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ করিয়াছে-তাহা ভাদু পূজা নামে পরিচিত ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা আদিবাসীদের 'করম' উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র। নৃত্য এবং গীতই করম উৎসবের প্রধান অংগ। ভাদু পূজারও তাহাই, তবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর গৃহে ইহার নৃত্যাংশ স্বভাবতঃই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আদিবাসীদের করম উৎসব বর্ষা উৎসব ভাদু উৎসবও বর্ষা উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ষা বা ভরা ভাদ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদু-উৎসব। ইহার গান ভাদু গান। কিন্তু আধুনিক কালে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র কিংবদন্তীর উদ্ভব হইয়াছে। তাহা এই—আনুমানিক ১৮১৩ সালে মানভূম জিলার পঞ্চ কোটের রাজধানী কাশীপুরে নীলমণি সিংহ দেবশর্ম্মা নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার ভদ্রেশ্বরী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। ভদ্রেশ্বরী বয়প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তাহার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রাজান্তঃপুরের মধ্যে অধিকাংশ অনূঢ়া রাজকন্যার জীবন যে ভাবে কাটিয়া যায়। তাহার জীবনও সেই ভাবেই কাটিতেছিল। এই ভাবেই একদিন ভদ্রেশ্বরী পরলোক গমন করিলেন। প্রাণাধিকা কন্যার অকাল পরলোক গমনে রাজা নিদারুন ব্যথিত হইলেন। তিনি তাহার রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন রাজকন্যার স্মৃতি রক্ষার জন্য ভাদ্রমাসে পল্লীতে পল্লীতে তাহার নামে উৎসব পালন করিতে হইবে। প্রজাগণ সানন্দে আদেশ পালন করিল।

তারপর মানভূম হইতে তাহা বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল। আধুনিক কালে রচিত বহু ভাদু গানের ভিতর দিয়াই এই বিষয়টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বহু পূর্ব হইতেই এই উৎসব এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহার সঙ্গে কাশীপুর রাজ ও তাঁহার কন্যার নাম আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। কাশীপুর রাজ পরিবারের এই বিবরণটি ঐতিহাসিক সত্য। এ প্রসঙ্গে ভাদুর পরিচয় দিতে গিয়ে ভাদু কবি গেয়েছেন—

জানো কি ভাদুরাণীর পরিচয় ?
যেথা সেথা ভাদুর পূজা কি কারণে হয়।
এল ভাদু কোথা হতে
কে পারে ভাই সন্ধান দিতে
শুনেছিলাম মানভূমেতে রাজবাড়ীতে জন্ম হয়।।
ভাদু আমার রাজার মেয়ে, পণ ছিল যে করবে না বিয়ে
ছিল তাই আইবুড়ো হয়ে কত লোকে কত কও
আই বুড়ো বয়সে ভাদু, ছিনে নিলে আপন বঁধু
পান করে রাই কমল মধু সেই ত পতি সুনিশ্চয়।।
ভাদু আমার ছেলেবেলা করেছিল কত লীলা
যৌবনেতে রাজবালা চোখে অগোচর হয়।
সারা ভাদর লীলা করে সংক্রান্তিতে লুকালো রে
হা ভাদু, হা ভাদু বলে রাজরাণীর ধারা বয়।
সেই অবধি রাণী রাজা, প্রচার করেন ভাদুর পূজা
ভক্তিতে যে করে পূজা, দূরে যায় তার যম ভয়।।
অদ্যাবধি ভাদ্রমাসে আসে ভাদু ভাবা বেশে
বিশু বলে ভালবেসে দাও গো সবে ভাদুর জয়।

ভাদ্রমাসের প্রথম দিন কুমারীগণ একটি মৃন্ময়ী নারী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে তার আগমনী গান গেয়ে থাকে 'আদরিণী ভাদুরাণী এল আজি ঘরকে।' ভাদু রাজকুমারীর লৌকিক কাহিনী জনগণকে দুঃখ দেয় তবে বর্তমান ভাদু রাণীর মূর্তিটিকে দেবী রূপে পূজা করে। এক মাস ধরে নানা বন্দনা গানে তাঁকে আহ্বান করে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে অশ্রু সজল নয়নে পুষ্করিণীর জলে

বিচ্ছেদের গান গাইতে গাইতে বিসর্জন দেয়। ঠিক যেন প্রিয় জনের মত তারা ভাদুরাণী ভালবেসেছে তা গানের মধ্যে প্রকাশমান। ভাদুর আগমনী প্রতিক্ষায় গ্রামবাসীরা সারা বছর অপেক্ষা করে যখন ভাদ্র মাস তখন আর তাদের আনন্দ ধরে না। তখন তারা গায়—

সোনার বাংলা দেশে
হেরি কী আনন্দ দেখ
ভাদ্র মাসে।
নন্দমণি শ্বেতবরণী গো
হেরি মোর এই বারে
বিশুর বাণী ধন্য আমি
জন্ম আমার এই মাসে।

ভাদু এসেছে শুনে গ্রামের মানুষের মন তাকে দেখার জন্য আনচান করে তাই তারা উচ্ছ্বাসে গায়—

জল ঝমা ঝম ঝম
সুখের ভাদ্রে ভাদু এল
সব দুঃখ ভেসে গেল
বরষ পরে হরষ ভরে
ঘর গম্ গমা গম্ গম্।

কোথায় ভাদুকে কন্যা রূপে আবার কোথায় মাতা রূপে তাঁকে আদর যত্ন করছে আবার পুজো করছে। কাশীপুরের রাজা কন্যা রূপে তাঁকে নানারকম ভোগ উপাচারে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। এরকম একটি ভাদু গানে দেখা যায়

কাশীপুরের রাজার বিটি
সোনার খাটে বসন।
রূপার খাটে চরণ দিয়া
হীরায় দাঁত ঘষণ॥
চন্দন কাঠের উনন
আগুন করে গণ গণ
হাঁড়ি কুঁড়ি ঠন ঠন
পঞ্চ পঞ্চাশ ব্যান্নোন
রাণী করে রন্ধন॥

ঘি-সপ্ সপ্ সৌরভ ছুটে
ভাদু করেন ভোজন।
ক্ষীর সর ছানা ননী
ছোয়না ভাদুমনি
ইঁদুর পিঁপড়া পেটটো ভরায়
কে করে যতন ॥

প্রতিবেশীরা ভাদুর রূপ নিয়ে রেশা রেশি করে তার পরিচয় পাওয়া যায় দুদলের গানের লড়াইএ। এক পরিবারের মেয়েরা তাদের প্রতিবেশীদের ভাদুর মূর্তির খুঁত বার করে যখন গায়—

দেখে যা লো তোরা।
ভাদু দেখে হইছি লো দিশে হারা ॥
রূপের ছট ঘনঘটা লো, আলো, ঘর আঁধার করা
আন্‌মনেতে বসে আছে, ঠিক যেন ক্ষেশীর পারা
মুখের ছিরি, আহা মরিলো, শ্রাবণ মাসের মেঘকরা।
চোখ দুটো তার বেলের মতন ঠিক যেন আগুন পারা।
নাকটায় যেন বেং বসেছে লো, ঠোঁট দুটো ভকু করা।
দেখে শুনে এমন ভাদু আন্‌লি কেন সইয়েরা ॥
হাত পা সরু পেটটা মোটালো, তাতে আবার গাল পোড়া।
বুঝি রোগ ভোগ ক'রে ভাদু তোদের, হইছে লো এমন ধারা ॥

তৎক্ষণাৎ অপর পরিবারের মেয়েরা উত্তর দেয়—

ভাইরে, মনে মনে।
আমার ভাদুর রূপ দেখে জ্বলিস্ কেনে ॥
আমার ভাদুর রূপটি তোদের লো, চোখে বল সইবে কেনে।
সূর্যের আলো দেখলে পেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে
তেমনি তোরা ভাদু ধনে লো, দেখতে নাল্লি নয়নে।
তোদের ভাদু, আমার ভাদু, তফাৎ লো রাত্রি দিনে
সত্য মিথ্যা দেখ না চেয়ে, চোখ থাকতে অন্ধ কেনে
তোদের ভাদু আনা মুখী লো, ভেবে দেখ মনে মনে
তপড়া গালী চেপ্টাবুকী পান্তাখাকী তার সনে ॥

আস্তা কুড়ের সর্কাড় থাকী লো বসা গা তায় সেইখানে।

আমার ভাদুর সনে তোরা সমান করিস্ কেমনে।

রাজকুমারী ভদ্রেশ্বরীর অপমৃত্যুতে রাজারাণী শোকাতুর হয়েছিলেন তাই অনুগত প্রজাগণ তাঁদের আক্ষেপ লাঘব করবার জন্য ভাদুর স্মৃতি রক্ষার্থে মূর্তি তৈরী করে আবার বিয়ে দিতে মনস্থ করেছে।

প্রতিবেশীনীরা ভাদুর বিয়েকে যেন নিজেদের মেয়েদের বিয়ের সংগে তুলনা কোরে মনের কথা গানে প্রকাশ করেছে

ভাদুর বিয়া দিব আজ নিশীথে

ভাদুর বর আসছে এবার উড়োজাহাজেতে।।

হলুদ মেখে অংগখানি ব'সে আছে চাঁদবদনী

শুভ লগনে শুভমিলন আশাতে ॥

চল সবে জল সইতে, বাজনা বাজিবে সংগেতে

ভরিব ভক্তি করে নূতন কলসীতে।।

আমার ভাদুর বয়স যত, জামাই করব মনের মত,

সরল প্রেম রসের প্রেমিক জনেতে।।

নবীনা প্রেমিকা ভাদু। কতশত জানে জাদু।

কতজনে মজায় চোখের চাওনিতে।।

কথায় আছে 'ভাদরের বেলা আদরে যায়' দেখতে দেখতে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি তাড়াতাড়ি ভাদুকে ডাক দিল। প্রতিবেশীনীরা ভাদুকে নিয়ে যে কত আদর আপ্যায়ন আশা আকাঙ্ক্ষা একমাস ধরে করেছে তার শেষের পালায় ঢাক বাজল। এল ভাদুর বিসর্জনের পালা। প্রতিবেশিনীদের শূণ্য হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। তাই তাদের করুণ সুরে আকাশ বাতাস ক্রন্দিত হয়ে বলে ঃ—

ভাদু, বিধুমুখী

এস এস হৃদয়ে ধরে রাখি ।।

বিদায় কথা শুনে তোমার গো অবিরল ঝরে আঁখি।

(তুমি) যেও না লো, বিনয় করি আমাদের দিয়ে ফাঁকি।

(তুমি) মোদের প্রাণের আধার গো। তোমায় অধিক বলব কি

(এলে) বছর পরে থাক দু'দিন, আমাদের ক'রে সুখী।

ঠিক দেবী দুর্গার অনুকরণে ভাদুরাণী সম্বন্ধ ভাদুকবিগণ গান বেঁধেছেন

আগমনী, ভাদুবন্দনা, ভাদুবিসর্জন কিন্তু এর স্বাতন্ত্রতা সৃষ্টি করে রচনা করেছেন ভাদুর পরিচয়, ভাদুর রূপ ও সজ্জা, ভাদুর বিবাহ, ভাদুর ভোজন ইত্যাদি। কিন্তু ভাদু বন্দনা গানটি যেন দেববন্দনার মত শোনায়। তার একটি উ দাহরণ দেওয়া গেল।

জয় জয় ভাদু মাতা গো
ও মা বিশ্ব জননী ॥
আর ভাদ্র মাসে ভাদু পূজাগো
ও মা পূজি তোমার চরণ দুখানি।
(ও মা পূজি তোমার চরন খানি)
ও মা না জানি তোর কাহিনী।
ভাদ্র মাসে এলে ভাদু গো
ও মা হ'লে ঘরে কাঙালিনী
আর পুরাণে জানি আমি গো
তুমি কাশীপুরের রাজরাণী।

বর্তমান যুগের পরিপেক্ষীতে বহু গ্রাম্য কবি ভাদুর ওপরে গান রচনা করেছেন তার শেষ নেই।

ভাদ্র মাসে লক্ষ্মী পূজার সময় যেমন হয় ভাদু উৎসব তেমন পৌষ মাসে লক্ষ্মী পূজার সময় সুরু হয় তুষ তুষলীব্রত এবং টুসু পরব বা উৎসব। মানভূমে থেকে পশ্চিমবাংলায় তুষ টুষ নাম ধারণ করে পল্লীবালাদের কাছে ভাদুর মত আদরনীয়। অতুলনীয় এবং পূজনীয়।

পল্লীবধূরা মাটি দিয়ে তুষু ঠাকুরুণ তৈরী করে। এইটি একটি ছোট মাটির পুতুল। তারপর এই ক্ষুদ্র পুতুলটি হয় তাদের ক্ষুদে দেবতা তাকে নিয়ে সারা পৌষ মাস ধরে চলে গান ছড়া তার ইয়ত্তা নেই। প্রথমে বেশ ভাল সাজিয়ে গুছিয়ে টুসুর নামে গান বাঁধে

আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে পদ্ম, পদ্ম বই আর ফুটে নাই
হামাদের টুসুর পায়ে পদ্ম ভ্রমর বই আর জুটে নাই।

টুসুর রূপের জ্যোতি বর্ণনা করতে

বেলা ওঠে রিতি-রিতি পৃথিবী আলো করে
এমনি আলো করবে টুসুও কেলি-কদমতলে।

কুমারী মেয়েরা টুসুকে ভালবেসে খেলার সাথী করে বলে

চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব কুলি-মুড়ার বটতলা
ফিরবার সময় দেখাই দিবলো পলাশ পাতে জলতোলা ॥

গ্রামীণ বধূদের টুসুর পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে আশঙ্কিত হতে হয় যেমন

আমাদের টুসুর একটি ছাইল্যাকে পাঠায়ল কইলকাতা,
ভালয় ভালয় ফিরে আইলে যানে দিব জোড়া পাঠা ॥

ভাদুর মত টুসুকে পাড়াপড়শীদের ঈর্ষার সীমা নেই

একদল প্রতিবেশিনী বলে

হামাদের টুসু মুড়ি ভাজে সাত কবাটের ভিতরে
তোদের টুসু জেংলি মাসী আঁচল পেতে লেয় মুড়ি
ছি ছি লাজ লাগেনা ! ছোট মুখে বড় কথা তোদের সাজেনা।

অপরদল তাদের জবাবে উত্তর দেয়

হামাদের টুসু হলুদ বাটে যেমন মেচা মেচা লো
তোদের টুসু বসে আছে যেমন চুঁচু পেঁচালো ॥

পৌষ সংক্রান্তির ভোরে চারিদিক উতরোল করে তোলে টুসু বিদায়ের পালা তখন শোনা যায় করুণ সুরের প্রাণহীন গানের দুটি লাইন :

আরে আরে বাজন দারিয়া ঢাকে খাড়ি দেনারে
শেষ রাইতে কোকিল ডাকে টুসু বিদায় দেনারে ॥

তারপর টুসুকে নিকটবর্তী কোন পুকুরে ভাসান দেওয়া হয়। ভাসান দেখার জন্য যে সকল পল্লীনারী ভিড় করে তাদের দলটি গেয়ে চলে

তিনটি টুসু জলকে যায় গো কোন্ টুসুটা ভাল।
মধ্যের টুসু ছলক্দারী জলে আঁখি ঠারে লো ॥

পশ্চিমবাংলায় ভাদু ও টুসু লোক সংগীত পল্লীবাসীদের কাছে খুবই প্রিয় কারণ ভাদু টুসুকে সাথী করে গ্রাম্যবালাদের সারা বছরের পুঞ্জীভূত কথা-আশা আকাঙ্ক্ষা মিটায়। তাই গ্রামীণ কবির কণ্ঠে মোটা সুরে ধ্বনিত হয় :—

আমার মনের মাধুরী।
সেই বাংলাভাষা করবি কে চুরি ॥
আকাশ জুড়ে বিষ্টি নামে মেঠো সুরের কোন চুয়া।

বাংলা গানের ছড়া কেটে আষাঢ় মাসে ধান রুয়া

(মনের মাধুরী)

মনসাগীতি বাংলাগানে শ্রাবনে জাত-মঙ্গলে ॥
চাঁদ বেহুলার কাহিনী পাই চোখের জলে গান বলে।
বাংলা গানে করলো সই ভাদু পরব ভাদরে
গরবিনীর দোলা সাজাই ফুলে পাতায় আদরে
বাংলা গানে টুসু আমার মকর দিনে সাঁকরাতে।
টুসুর ভাসান পরব টাঁড়ে টুসুর গানে মন মাতে ॥

(মনের মাধুরী)

অনেক জায়গায় পশ্চিমবাংলার পল্লীবাসীরা আদিবাসীদের ঝুমুর গানে প্রভাবান্বিত হয়ে ভাদুর নামে ঝুমুর গান বেঁধেছে যেমন—

তিং দাং দাং তিনাং নিদাং
পিন্দাড়ে হাত লাগালি,
ভাদুলো, তুই নাগরে ভুলালি
ধন্য ধন্য রূপ তোর,
(বঁধুর) করে দিলি নিশি ভোর,
সাবাস মাইরি মধু তোর
ঐ মুখে কি মধু চাটালি ।।

বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে লোককবিদের কণ্ঠে সাঁওতাল ও ওরাঁও আদিবাসীদের প্রভাব নিঃশব্দে ঢুকে গেছে তার প্রমাণ গানগুলিতে বর্তমান।

বাংলার লোক সাহিত্যে ছড়ার ইতিবৃত্ত

ছড়া কোন যুগ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা কঠিন তবে ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টীয় অষ্টম-ত্রয়োদশ শতকে বৌদ্ধ সহজ পন্থী এবং শৈবপন্থীদের অপভ্রংশ ছড়া আবিষ্কার করেছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকরা বহু ছড়া রচনা করেছিলেন। সেগুলিকে ডাকের ছড়া বলা হয়। ডাকের ছড়াগুলি নীতিমূলক ছড়া যেমন ঃ—

নিয়ড়ে পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে॥

এ রকমের ছড়া বাংলা, আসাম এবং ওড়িষায় পাওয়া গেছে। ডাকের ছড়ার অনরূপ গাজীর ছড়ায় দেখা যায়

বান্ধি বাড়ি যেবা নারী পুরুষের আগে খায়।
ভরা কলসীর জল তায় তরাসে শুকায়।
এলায়ে মাথার কেশ ফিরে পাড়া পাড়া।
লক্ষ্মী বলে সেই নারী জেনো লক্ষ্মীছাড়া।

ডাকের বচনে নারী সম্পর্কিত নীতিবাচক এই গাজীর ছড়ার সঙ্গে মিল দেখা যায় যেমন ঃ—

পাণী ফেলিয়া পাণীকে যায়।
আন পুরুষে আড়ে চায়॥
তারে নাহি বলিহ সতী।
স্বরূপে সে দুষ্ট মতি॥

ডাকের বচন যেমন নীতিবাচক তেমন খনার বচন উপদেশ মূলক। মানুষের জীবনের দৈনন্দিন যা কাজে লাগে এই ছড়াগুলির মধ্যে পাওয়া যায় যেমন চাষীর শস্য গণনা, শস্য রোপণ, বৃষ্টি গণনা, এবং নানা প্রাকৃতিক বিষয়ে এর ভেতর থেকে মহামূল্যবান তথ্য জানতে পারা যায়। যেমন কয়েকটি ছড়া উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ—

(১) ডেকে ডেকে খনা গান। রোদে ধান ছায়ায় পান ॥

(২) শ্রাবনের পুরো, ভাদ্রের বারো।
এর মধ্যে যত পারো ॥

(৩) ষোল চাষে মুলা। তার অর্দ্ধেক তুলা।
তার অর্দ্ধেক ধান। বিনা চাষে পান ॥

পূর্ণিমা কিংবা অমবস্যায় হাল ধরা নিষিদ্ধ। তাই খনা বলেছেন

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ হয় চিরকাল ॥
তার বলদের হয় বাত। ঘরে তার না থাকে ভাত ॥
খনা বলে আমার বাণী। যে চষে তার হবে হানি ॥

বহু যুগ ধরে খনার বচনে চাষীদের অগাধ বিশ্বাস ছিল আর তারা এই ছড়া-গুলি অনুধাবণ করে কাজে নামত। খনা চাষের একটি ছড়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছেন।

সাত হাতে তিন বিঘতে। কলা লাগাবে মায়ে পুতে।
লাগিয়ে কলা না কাটো পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

যাঁরা ফলগাছ লাগাতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে খনা বলেছেন :—

হাত বিশে করি ফাঁক।
আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ ॥
গাছাগাছি ঘন সবে না।
ফল তাতে ফলবে না ॥

কিন্তু বর্ত্তমান কৃষি-বিজ্ঞানের প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে কৃষকরা ছড়া ভুলে যাচ্ছেন।

ছেলে ভুলানো ছড়া বাংলা লোক-সাহিত্যের অরুণোদয়। যখন বাঙালি জন্ম গ্রহণ করেছিল তখন থেকে ছেলে ভুলানো গান ও ছড়া চলে আসছে তার হয়ত সময়ের পরিপেক্ষীতে হেরফের হতে পারে কিন্তু আবহমান কাল থেকে মা ও শিশুর সম্পর্ক যেমন চলছিল তা এখনও চলছে এবং চলবে তার কোনদিন পরি-বর্তন হবে না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিশু শ্রীমন্ত কে মা ভুলচ্ছেন একটি ছড়ার মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন :—

আয় আয়রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায় ॥

তুলিয়া আনিব গগন ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল ॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর ॥ ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে লিখেছেন আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু স্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান্। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলা-বিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘ-বিজ্ঞানও শাস্ত্র-নিয়মের মধ্যে ভাল করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃংখল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশুসত্তাকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিকে স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। তাই দেখা যায় প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে ছেলেভুলান গান ও ছড়া বিরাট স্থান অর্থাৎ মায়ের মনের জগৎ অধিকার করে আছে। প্রাচীন ছেলেভুলান ছড়ায় মায়ের স্নিগ্ধ প্রাণের আভাষ পাওয়া যায় :—

আয় রে আয়।
কি লেগে কাঁদিল রে বাছা কি ধন তোর চাই ॥
খাওয়াইব ক্ষীরমণ্ড মাখাইব চুয়া।
পাকা পাকা পান দিব সরেস গুয়া ॥
রাজার দুহিতা করাইব বিয়া।
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন দিয়া ॥
তুলে এনে দিব গগন ফুল।
একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল ॥
সে মূলে গড়াব হার সোনার।
আমার যাদুরে কেঁদনা আর ॥

কোন অতীতের স্মৃতি বিজড়িত ছবি খানি এ ছড়ায় আমরা দেখছি ঠিক তেমনি বর্তমান যুগে একই ছবি আমাদের চোখে পড়বে ছলে ভুলান ছড়ার মধ্যে তার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেখান হল :—

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ী যেয়ো।
বাটাভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো

শান বাঁধান ঘাট দেব বেসম মেখে নেয়ো।
শীতল পাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো ॥
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে
দুই দুই বাঁদী দেব পায়ে তেল দেবে
উড়কি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই।
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়ি ভরা দই ॥

মা শিশুকে 'সব আদরের ধন' বলে মনে করে। তার কুমারী ব্রতের সময় কেবল কামনা করে বিয়ে হয়ে গেলে মনের আশা যেন পূর্ণ হয়। পুতুল খেলা থেকে শিব পূজায় যে মনের মাঝে স্বপ্ন হয়েছিল এখন সেই শিশুকে বাস্তবে পেয়ে আর আনন্দ ধরে না। আবার তার বাস্তব খেলাঘর শুরু হয়ে যায় এখন তার গৃহখানি মুখরিত হয় শিশুর ক্রন্দনে। যখন শিশু কাঁদে তখন মা বলে

পুঁটু আমার কেঁদেছে।
কত মুক্তা পড়েছে ॥
যখন পুঁটু আমার হয় নাই।
ভিখারীতে ভিখ নেয় নাই ॥
ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে।
ভিখারীতে ভিখ নিয়েছে ॥

শিশুর বয়ষ যখন মাস ছয় হয় তখন মা শিশুর ছোট্ট পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে নাচায় সে নাচল তখন মা নিজ সুরে গান ধরে—

ধনকে নিয়ে বনকে যাব থাকব বনের মাঝে।
আর দেখিনি নীলমণি, তোর কেমন ঘুঙুর বাজে ॥
তোরে নাচালে কেমন সাজে।
ঝুনুক ঝুনুক বাজে ॥

মা কখনও শিশুকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে আদর করছে আবার কখনও সে চাঁদক শিশুর মামা বলে সম্বোধন করে বলে 'আয় আয় চাঁদ মামা আমার খোকনের কপালে টি দিয়ে যা মা গান ধরে—

"আয় আয় চাঁদ মামা
টি দিয়ে যা

চাঁদের কপালে চাঁদ
টি দিয়ে যা ।।”

আবার বলে “চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ
হিঞে বনে শচী
ঐ এক চাঁদ ঐ এক চাঁদ
চাঁদে মেশামিশি” ।

মা সব সময় আশংকা করে তার সন্তানকে কেউ নজর দিচ্ছে কিনা যদি শিশুর শরীর অসুস্থ হয়ত কথাই নেই। তখন সে বলে ঃ

সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে।
খোকন কে যে খোঁড়ে ।।
তার মুখটি পোড়ে।
আর যে খোঁড়ে মনে মনে।
পুড়ে মরুক আঁধার কোণে ।।

দুধ খাওয়ান শিশুকে একটা বড় সমস্যা তখন তাকে নানা গান ও ছড়ার অবলম্বন নিতে হয়। মা গান গেয়ে বলে

সাইর নাচে শালিক নাচে মাদার পুষ্প খাইয়া।
দুধর ছাবাল নাচে মায়ের কোল পাইয়া ।।

কোল নাচিয়ে পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে মা শিশুকে ঘুম পাড়ায় এই বলে।

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ী যেয়ো।
সরু সুতার কাপড় দেবো ভাত রেঁধে খেয়ো ।।

মার কণ্ঠে এত ছড়া এত গান কি করে যোগায় তা শুনে অবাক হতে হয়। যতক্ষণ না শিশুটি ঘুমাচ্ছে ততক্ষণ তার নিস্তার নেই।

আয়রে পাখী হুমো।
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো ।।
আয়রে পাখী লেজ ঝোলা।
আমার গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা ।।

শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি হয় চঞ্চল আর হয়ে উঠে দুরন্ত তখন তাকে সামলানো বেশ-কষ্ট সাধ্য ব্যাপার তাই মাকে উদ্ভাবন করতে হয় তাকে শান্ত

করে বসিয়ে রাখার পদ্ধতি ছোট ছোট খেলার মধ্যে। মা ছোট শিশুটিকে বসিয়ে সামনে হাত দুটি মাটিতে রাখতে বলে তারপর ছোট্ট আঙুলের ওপর এক একবার একটি আঙুল চালিয়ে বলে।

ইচিং বিচিং।
জামাই চিচিং॥
তায় পল্লো মাকড় বিচিং॥
মাকড়েরা লড়ে চড়ে।
সাত কুমড়ার ডিম পাড়ে।
এলের পাত।
বেলের পাত॥
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাড়ি॥
চাল কাড়িতে হলো বেলা।
খলসে মাছের চোকা
উড়ে বসে পোকা॥

আবার একটি খেলায় খোকাখুকুকে বাবু করে বসিয়ে তার হাটুতে হাত দিয়ে বলে

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাঁই মিরগেল ঘাঘর বাজে॥
বাজতে বাজতে পল ঠুলি।
ঠুলি গেল কমলা ফুলি॥
আয়রে কমলা হাটে যাই।
পাণ গুয়াটা কিনে খাই।
কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল॥
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, কদম তলায় কেরে।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দেড়ে॥

শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খেলাগুলিও পরিবর্তিত হয় তখন ছোট

দুটি ভাই বোনে কথা কাটাকাটি খেলার ছড়াগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক :—

কি কথা ? বেঙের মাথা
কেমন বেঙ ? সরু বেঙ ?
কেমন সরু ? বামণ সরু।
কেমন বামণ ? ভোট বামণ।
কেমন ভোট ? ঘোড়ার চাট।
কেমন ঘোড়া ? বাঁদর বাচ্ছা।
কেমন বাঁদর ? মুড়ার বাঁদর।
কেমন মুড়া ? পাতা মুড়া।
কেমন পাতা ? মিছা কথা।

শিশু তিন চার বছর হলে মা তাকে কত দেশের গল্প, কত জীবজন্তুর গল্প, রূপকথা যেন গল্পের শেষ নেই। শিশু নিমগ্ন চিত্তে মায়ের অপরূপ মুখ থেকে শোনে সেই সব গল্প তন্ময় হয়ে মা গল্প বলতে বলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পরে তখন বলে :—

আমার কথাটি ফুরাল
নটে গাছটি মুড়াল
কেনরে নটে মুড়ালি ?
গরুতে কেন খায় ?
কেন রে গরু খাস ?
রাখাল কেন চরায় না ?
কেন রে রাখাল চরাস না ?
বৌ কেন ভাত দেয় না ?
কেন রে বৌ ভাত দিস্ না ?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না ?
কেনরে কলাগাছ পাত ফেলিস না ?
ব্যাঙ কেন ডাকে না ?
কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না ?
সাপে কেন খায় ?
কেনরে সাপ খাস ?

খাবার ধন খাবনি ?
গুড় গুড়ুতে যাবনি।

বৃষ্টি পড়লে মা শিশুকে বলতে শেখায় বৃষ্টির ছড়া তখন শিশু আদ আদ ভাষায় তা বলতে থাকে ঃ—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান,
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান।

রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত সংগৃহীত ছড়াটি আবহমান কাল থেকে ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে চলে আসছে। দক্ষিণারঞ্জণ মিত্র মজুমদার তাঁর 'খুকুমনির ছড়ায়' ঐ রকম একটি ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন যেমন ঃ—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে গোঁসা ভরে বাপের বাড়ী যান॥
বাপেদের তেল সিন্দুর মালীদের ফুল।
এমন খোঁপা বেধে দেবো হাজার টাকা মুল॥

ছেলের পাঁচ বছরে হাতে খড়ি আর মেয়ের পাঁচ বছরে কান বিদুনীর সঙ্গে সঙ্গে দুজনের জগত যেন পৃথক পৃথক হয়ে যায় তখন তারা আর পূর্বতন খেলা আর পছন্দ করে না। তারা নিজের গন্ডীতে চলে যায়। ছেলে হাডুডু খেলে আর মেয়ে খেলে মাটিতে চৌকা করে ঘর কেটে এক পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কা দোক্কা। খেলার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে স্বতন্দ্র ভাব লক্ষ করা যায়। হাডুডু খেলার ছড়া কোথাও কোথাও দেখা যায় যেমন একদল একটি ছেলে অপর দলটির দাগ টানা ঘরে এসে বলে ঃ

এক হাত বোল্লা বার হাত শিং
উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং তিং

পশ্চিমবঙ্গে চু টেনে অপর দলের কাউকে ছুলে সে বসে পড়বে এ রকম দু'দলে হার জিত খেলা হয়।

পাঁচ বছর বয়স থেকে মা মেয়েকে শেখায় নানা ব্রত এইটি হল মেয়েলী ছড়ার

প্রারম্ভিক। দক্ষিণারঞ্জণ মিত্র-মজুমদার তাঁর ঠানদিদির থলের প্রথম খন্ডে 'কুমারী ব্রতে' লিখেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন 'কুমারী-ব্রত' নিজেই একটি দেবকন্যা। ব্রতের যে কঠোরতা, তাহার একরূপ লেশমাত্র ইহাতে নাই। বরং আমোদ সুষমার ইহা কন্যাদের পুলককর। কুমারী ব্রতে নারী জীবনের কঠোরতা এবং সংসারের সকল কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা শিক্ষা দেয়। তিনি কুমারী ব্রতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন। 'এই ব্রত, ব্রত এবং এ দেশের বালিকাদের খেলা। এমন খেলা আর কোথায় আছে জানি না। ব্রত-দেববালা, বঙ্গ বালিকার খেলা কতই কেমন সুন্দর করিয়া তুলে। তাহাদের ধুলো-খেলার পুতুল দেখিতে দেখিতে টাটে উঠে। তাহাদের ক্রীড়া সংগীতের কলস্বরে-ললিতামৃত সুরে। শিশু ভাষায় অতুল কোমল অভিধানহীন মধুমাখা কথায় প্রাণময় কামণার মন্ত্র উচ্চারিত হয়। খেলিতে খেলিতে ধর্ম্ম, খেলার অপেক্ষা হর্ষ, আনন্দ, সৌন্দর্য, খেলিতে খেলিতে সরল সুন্দর বালিকার হৃদয় নিহিত মাতৃত্ব, বধুত্ব, সর্ব্বভ আত্মীয়তা, সর্বজীবে দয়া, করুণা, স্নেহ, ভালবাসা—ত্যাগ, অকল্যাণ নিবারণ—কামনা—নারীত্ব—দেবীত্ব সহসা যেন কোন মহানভাবে কোন উচ্চ স্বর্গাগত অমৃতযষ্ঠির স্পর্শে পরিপূর্ণ বিরাটত্বের পথে বিশ্বে অগ্রসর হইবার আভাষ দিয়া উঠে। শিশু কাল থেকে মা মেয়েকে পরের ঘর যাবার জন্য কত ছড়া তৈরী করে। ক্রমে ক্রমে ব্রতের মধ্যে দিয়ে শিশুর কুসুম মনে তার স্বপ্ন জাগাতে থাকে। সেঁজুতি ব্রতে মা মেয়েকে শেখায়—

বাঁশের কোঁড়া শালের ঢোঁড়া ;
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি।
আমি যেন হই রাজার ঝি ॥
কোঁড়ার মাথায় ঢালি মৌ।
আমি যেন হই রাজার বৌ ॥
কোঁড়ার মাথায় ঢালি চিনি ॥
আমি যেন হই রাজার রাণী ॥

মেয়েলী-জীবনের প্রারম্ভে কুমারী ব্রত থেকে মেয়েরা যখন ঘর সংসার করতে আরম্ভ করে তখন হরির চরণ ব্রত করে। এই ব্রত করলে কি ফল লাভ হয়, ব্রতীরা বলে ঃ—

হরির চরণ হরির পা, হরি বলেন ওগো মা
আজ কেন মা পা'টি শীতল, কোন রমণী পূজছে মা বল্।
সে যুবতী কি চায় বর, চায় বুঝি তার মনোমত বর।
রামের মত স্বামী পাবে, লক্ষ্মণের মত দেবর হবে।
কৌশল্যার মত শাশুড়ী চায়, আর কি চায় মা আর কি চায়
দরবার জোড়া ব্যাটা চায়, সবার সেরা জামাই চায়।
আনুলার কাপড় দল্ দল্ করে, সিঁথির সিঁদুর ঝলমল করে।
পায়ের আল্তা টক্টক করে, ঘটী বাটি সব ঝক্ ঝক্ করে।
গোয়ালে গরু খামারে ধান, যুগ যুগ যেন বাড়ে মান।
বছর বছর পুত্র হোক, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে রোক।
এক গলা গঙ্গার জলে, মরণ হবে স্বামী-পুত্রের কোলে।

পুরাকালের ব্রতের ছড়াগুলি সমস্যাসংকুল আধুনিক যুগে অচল বলে মনে হবে কারণ সরকারের পরিবার পরিকল্পনায় নতুন ছড়ার উদ্ভব হয়েছে। গ্রাম্য নারীরা বছর বছর পুত্র হোক আর আকাঙ্ক্ষা করে না তারা সরকারী ছড়ার অনুগামী হচ্ছে।

যদি সুখী পরিবার গড়তে চাও।
দুটির বেশী একটিও নয়॥

ডাঙ্গায় সাপ, জলে কুমীর আর বনে বাঘ তার ভয়ে বন্যাঞ্চলের গ্রামবাসীরা সবসময়ই সশংক হয়ে দিন যাপন করে। সেজন্য তারা নানা ছড়া মন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে কালাতিপাত করে থাকে। দক্ষিণ রাঢ়ে ও সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় এবং কুম্ভীর দেবতা কালু রায়কে নিয়ে বহু কবিতা ও ছড়া রচিত হয়েছিল। সুন্দর বনে হিন্দুর দেবতা দক্ষিণ রায় আর মুসলমানের পীর বড়-খাঁ গাজীর বিরোধ নিয়ে 'গাজীর গান' রচিত হয়েছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণা এই দেবতাদের পূজা দিলে তারা বিপদ থেকে উদ্ধার হবে।

সুন্দরবনের নদী খালের ধারে আর গাছের তলায় ব্যাঘ্রবাহন সিপাহীবেশী দক্ষিণ রায়ের মূর্তি দেখা যায় আর কালু রায় কুম্ভীরারোহী বীর দেবতার মূর্তি। এই দুই দেবতাকে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীরা পূজা দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া তারা দুএকটি মন্ত্রের ছড়া শিখে রাখে যদি একা বিপদে পড়ে তাহলে তার থেকে যেন মুক্ত হতে পারে যেমন বাঘবন্দীর ছড়া —

আদি বন্ধম্ অনাদি বন্ধম্
ষোড়শ-ডাকিনী ব্যাঘ্র বন্ধম্ ।
আমার গায়ে আমার অঙ্গে করে ঘা ।
কালিকা চন্ডীর মাথা খা ।
আমার আঁচলি লড়ে
শিবের জটা ছিড়িয়া পার্ব্বতীর নখে পড়ে ।।

তেমন সাপের বিষ ঝাড়াবার মন্ত্রছড়া এখানে প্রচলিত

গঙ্গা বলে দুর্গা তুমি বড় লঘু ।
বিষ খাইয়া মরেছেন ঘরের প্রভু ।।
কাঁদেন গঙ্গা কাঁদেন দুর্গা কাঁদেন বিষহরি হায় ।
বাপের বিষ কি ঝাড়ুন । ইত্যাদি

বাংলার লোক সাহিত্যে 'ঐতিহাসিক ছড়া' ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য এবং তৎকালীন দেশের অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটায় । এ সকল ছড়ার পরিচয় ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয় । মোটামুটি তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্যগুলি স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে ।

১২৪৯-৫০ সালে মারাঠা বর্গিদের পশ্চিমবঙ্গ লুন্ঠন, আলীবর্দ্দির পরাভব এবং জনসাধারণের বিরোধিতায় বর্গী সেনাপতি ভাস্কর-পন্ডিতের পরাভব ও নিধন । ১৭৫১ সালে এই বর্গীর ছড়া গণ মুখে প্রচলিত ছিল । মায়েরা ছেলেদের বর্গীর ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত । যেমন 'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে । বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে' । অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের রাজা 'কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্তিগাথা' রাই কৃষ্ণদাসের 'বীরভূমের সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া' রতন কবিরাজের বিষ্ণুপুরের 'মদনমোহনের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা' । তৎকালীন বেগার খাটনর ছড়া যেমন

ফেলা এ লাঁগল মাঠে
ফেলা এ লাঁগল মাঠে পালায় যত চাষিগণ
বেগার ধরিতে আইল কত শত জন ।
যেন চৈত মাসে
যেন চৈত মাসে ভস্ত্যা-ধরা ব্যপহারা যেদিকে যাকে পায়
হাতে বেঁদে গোন্ত্বা মেরে রাস্তাতে খাটায় ।

হাতে করে বেতের ঝাড়ি
যাবা দাবা বন্দ করে রাকে ধরে সন্দে কালে দুটি
কোদাল পিঠে ঝুড়ি হাতে যায় গুটি গুটি। ইত্যাদি

উত্তরবঙ্গের পল্লী কবি কৃষ্ণ হরিদাস ঐতিহাসিক ছড়া রচনা করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের আর এক কবি, পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রাম-নিবাসী রামপ্রসাদ মৈত্রের লেখা ঐতিহাসিক ছড়ায় ইংরেজ-শাসনের ব্যঙ্গ চিত্র পাওয়া গেছে যেমন

অপূর্ব্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
হাতে বেত শিরে দিলা টুপি।
বাঙ্গলার অভিলাষে আইলা সদাগর বেশে
কৈলকাতা পুরানাকুঠী আদি
গতামল সুভেদারী শুভসন বরহা ওরি
আংরেজ আমল তদবধি ।।

এ রকম কতশত ঐতিহাসিক ছড়া বাংলার পল্লীর আনাচে কানাচেতে পড়ে আছে তা ইতিহাস লেখার কাজে সাহায্য করতে পারে।

পশ্চিমবাংলায় প্রতি বছর বানের প্রকোপ অব্যাহত আছে সেই আদিকাল থেকে। তাই বানের ছড়া একসময় লোকের কাছে বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। ১২৩০ সালে দামোদরের বান কি ভীষণ আকার ধারণ করেছিল নিম্নের ছড়ায় তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ—

নদী সে দামোদরে বরাকরে করছে আনা গোনা
দুধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা ।।
এই বাণ পঞ্চকোটে, নিমেক লুটে ভাঙ্গলো রাজার গড়
হুড় হুড় শবদে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর
মিশায়ে নানা খোলা, বানের খেলা, নদী ব'হলো বল।
দামোদরে জড়ে হলো চৌদ্দ তাল জল। ইত্যাদি

বানের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন

মাটেতে ছিল ধান
মাটেতে ছিল ধান পেয়ে বান আথালি পাথালি
ছিল ইক্ষু অতি দীর্ঘ চেপে গেল বালি
রাজকর কিসে দিব

রাজকর কিসে দিব কি খাইব অন্তরে ভাবিয়া
স্থানান্তরে কেহ গেল দুঃখিত হইয়া। ইত্যাদি

এ রকম দীর্ঘ ছড়ায় বানের রূপ ফুটে উঠেছে তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের নানা ছড়া পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করলে বাংলার লোক সাহিত্য ভাণ্ডার আরও পুষ্ট হবে।

উপসংহারে স্বাধীনতার আগে কলকাতার আদি বাঙালী বাসিন্দারা যে সব প্রবাদ ও ছড়া বলতেন তার কিছু উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব। বর্তমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আর রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলি গেরস্তর অন্দর মহল থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। যেটুকু বেঁচে আছে তাও স্মৃতি পটে ক্ষীণ হতে বসেছে, এগুলি সংরক্ষণ না করলে তাও শহর সভ্যতার অতলে তলিয়ে যাবে। যেমন—

(১) চিঁড়ে বল মুড়ি বল, ভাতের বাড়া নেই
পিসী বল মাসী বল, মায়ের বাড়া নেই।

(২) মা নেই যার না' নেই তার।
অনাথের ছায়াই ছায়া মায়ের মায়াই মায়া।

(৩) কিসের মাসী, কিসের পিসী
কিসের বিনদাবন,
মাসী পিসী নয়কো বড়
মা বড় ধন।

এই ছড়াগুলিতে মা কতখানি সংসারে সন্তানের কাছে আপনার তা দেখান হয়েছে। মায়ের বয়স হলে সংসারে তাকে দেখাশুনা করার মত মেয়ে ও ছেলের ওপর নির্ভর করে কিন্তু তাদের বিয়ে দিয়ে নিজেই হাহুতাস করতে থাকে ঃ

বেটা বিয়ালাম বউকে দিলাম,
ঝি বিয়ালাম জামাইকে দিলাম।
আপনি হলাম বাঁদী, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি
মা-বাপ ঢেওঢেকনা, শালা শালজ নে ঘরকন্না।

এ ছাড়া বহু ছড়া ও প্রবাদ চলে আসত যেগুলি শাশুড়ী ও ছেলের বউএর সঙ্গে তিক্ত সম্বন্ধ ব্যক্ত করে, এমনকি ননদও মাঝে মাঝে এই দুজনের রণে দেখা দেয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল তাতে পাঠক পাঠিকারা

নিজেরাই অনুমান করে নিতে পারবেন, এর বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন হবে না।

বউ গিন্নী হলে তার বড় ফরফরানি।
মেঘ ভাঙা রোদ্দুর হলে তার বড় চড়চড়ানি ॥

বউ প্রার্থনা করে সে যেন একেশ্বরী হয়ে সংসারে আধিপত্য করতে পারে, তাই তার কথায় প্রকাশ পায় ঃ—

জা-জাউলী, আপনাউলী ননদ মাগী পর।
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর ॥

নতুন বউ ননদের টিপ্পনী ও গঞ্জনা একেবারে সহ্য করতে পারে না তাই সে মনে মনে বলে ঃ—

ননদিনী রায়বাঘিনী পাড়ায় কুচ্ছ গায়।
ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায় ॥

সংসারে যখন বউ কিছু আধিপত্য বিস্তার করে তখন যদি পরিবারে ঝগড়া-ঝাটি হয় তখন তার মুখ আলগা হয়ে যায় সে তখন জিহ্বা সংবরণ না করতে পেরে বলে ঃ—

শোনগো শ্বশুর, শোনগো ভাসুর, বলি তোমাদের পায়।
আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায় ॥
ভাতারের মা শ্বাশুড়ী, তারেই বড় মানি।
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাশঠাকুরানী।

বিবাহিতা মেয়ে বেশীদিন বাপের বাড়ী থাকলে তখন পৌরানারীরা বলে ঃ—

পান্তাভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।
সোনা নষ্ট বেনের বাড়ী, মেয়ে নষ্ট বাপের বাড়ী ॥
কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান।
বাপের বাড়ী থাকে ঝি, লোকে তাই বলে ছি ॥

সংসারে ছয়টি ছেলের ছয় বউ আসলে তার প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বর্ণনা দেখা যায়। এই ছড়ার সঙ্গে বউদের চরিত্রের মিল অনেকে খুঁজে পায়—

বউ বউ বড়ালের ঝি, কোণে বসে কর কি।
মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঁঝের আঁটি
সেজ বউ সেঁজুনী, সব কাজেতে এগুনী।

ন বউ নত্তা, সকল ঘরের কত্তা
নতুন বউ নথনী, শেওড়াগাছের পেত্নী
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট ঠাকুরপোর গোঁফে ঘাস।

কলকাতার বাঙালীদের পারিবারিক জীবনের কিঞ্চিৎ অধ্যায়ের ছড়াগুলি প্রাচীনারা সংরক্ষণ করতেন কিন্তু নবীনারা যে যুগে বাস করছেন সেখানে ঐ সব ছড়া অবান্তর হয়ে গেছে কারণ একান্নবর্তী পরিবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে, ভাইএ ভাইএ মিল নেই, সতীনের কোন বালাই নেই, তাছাড়া আধুনিক উপার্জনশীল মেয়েদের মাথায় অফিস, স্কুল আর কলেজ, এছাড়া আর কোন চিন্তার অবসর নেই।

বাংলার লোকসাহিত্যের পথিকৃত দীনেশচন্দ্র সেন

শত শত স্রোতস্বতী নানাদিক থেকে যেমন মিলিত হয় মহাসাগরে, তেমন বাংলা সাহিত্যের বহু সঙ্গমকে সংযোজিত করে এক বিরাট বিশাল সাহিত্য সাগরের সৃষ্টি করেছিলেন দীনেশচন্দ্র। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে এই বাংলার বরপুত্র মর্তে এসেছিলেন বাঙালী জাতিকে তাদের বিস্মৃত সাহিত্য পুনরুদ্ধার করে উপহার দিতে। বাঙালী একদিন সৌর্যবীর্যে যে মহীয়ান ছিল তার পরিচয় কোন অতলতলে ডুবে গিয়েছিল। দীনেশচন্দ্র যেন ডুবুরী হয়ে সাহিত্য মহাসাগর থেকে টেনে তুললেন সেই লোকসাহিত্যের জাহাজ যার মধ্যে ছিল কথা, গাথা ও গানের হীরা মণিমানিক্য যা দিয়ে আজ প্রতিটি বাঙালী নিজেকে জগৎ সভায় গর্ব অনুভব করে। বাংলা সাহিত্যের অমৃত পান করে বাংলার সন্তানরা কেবলমাত্র পরিপুষ্ট হয়েছিল তা নয় এর সঞ্জীবনী সুধা ভারতীয় অন্যান্য জনগণের ভাষা ও সাহিত্যকে সতেজ করে তুলেছিল।

বাংলার তমসাচ্ছন্ন দিনে দীনেশচন্দ্রের আবির্ভাব যেন এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তাঁর প্রাণে হয়ত দেবী সরস্বতীর বীণার রাগরাগিনীর যে ঝঙ্কার নিনাদিত হত তারই উম্মাদনায় তাঁকে বাংলাসাহিত্য সম্ভার আহরণের জন্য পাগলের মত এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দৌড়তে হয়েছিল। অন্ধকার পর্ণ কুটীর থেকে বহু কীট দংশিত পুঁথি উদ্ধার করে তিনি বাংলা সাহিত্যের যে নতুন আলোকপাত করেছিলেন তার কথা আজ প্রতিটি বাঙালী নম্র মস্তকে স্মরণ করবে। যে জাতির ইতিহাস নেই সে জাতি কোন সভ্যজগতের পংক্তিতে বসতে পারে না। সে কারণে দীনেশচন্দ্র যে মহান দায়িত্ব পালনে বাঙালী জাতির সেবা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। তিনি দিনের পর দিন অসীম ধৈর্য্য-সহকারে যে বিরাট বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণকার্যে ব্রতী ছিলেন তাহা ঈশ্বর পাওয়ার জন্য ঋষিদের তপস্যার চেয়ে কোন অংশে ক্ষুদ্র নয়।

দীনেশচন্দ্রের জীবন ও তাঁর বিশাল সাহিত্যের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষিত সাহিত্য-সেবীর পরিচয় ঘটেছে কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতি এখনও তাহা সম্পূর্ণ অবগত নয়! সে কারণে তার কিঞ্চিৎ অবতারণা করা যেতে পারে। দীনেশচন্দ্র ১৭ই

কার্তিক ১২৭৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ৬ই নভেম্বর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকা বাগজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ছিলেন তৎকালীন ইংরাজী বাংলা ও পারসীক ভাষায় সুপণ্ডিত। দীনেশচন্দ্রের জন্মের আগে তিনি বাংলা ভাষায় 'সত্য ধর্মোদ্দিপীকা' নাটক, ব্রহ্মসংগীত ও দিনাজপুরের ইতিহাস লিখেন। ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হন। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের মাতা ছিলেন নিষ্ঠাবতী গোঁড়া হিন্দু রমণী। তাঁদের দুজনের মধ্যে কোনদিন বাক্‌বিতন্ডা হত না ধর্ম নিয়ে যে যাঁর মত ও পথ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। দীনেশচন্দ্রের পূর্বে তাঁর এগারটি বোনের জন্ম হয়। তারপর তিনি ও তাঁর আর এক বোন দুজনে যমজ জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তিনি ছিলেন পিতামাতার নয়নের মণি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট তাঁর পিতা স্বর্গারোহণ করেন ও ছ'মাস পরে দীনেশ চন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয় তখন তিনি ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের বি. এ. শ্রেণীর ছাত্র। পিতামাতার মৃত্যুর পরই তাঁকে এক নিদারুণ আঘাত হানল যখন তাঁর পাঁচ ভগিনীর পরপর মৃত্যু হয়। তিনি জ্যেষ্ঠ বিধবা ভগিনী দিগবাসিনী দেবীর কাছে লালিত পালিত হন। দিগবাসিনী দেবীর শ্বশুরালয়ের সকলে ছিলেন পরম বৈষ্ণব সে কারণে তিনিও অত্যন্ত বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগিনী ছিলেন। সেই সময়ে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে বহু নিষ্ঠাবান পরম বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ক্রমশঃ বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন ও কীর্ত্তনগান শ্রবণ করে তাঁকে যেন সকল সময় চুম্বকের মত টানত। তাঁর জীবনে এই প্রথম লোকায়ত দর্শনের মূল প্রেরণা উৎসারিত হয়েছিল তাহা পরবর্তী লোকসাহিত্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করার কাজে সাহায্য করেছে।

দীনেশচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র বার বছর তখন তাঁর বিবাহ হয় কুমিল্লার উমানাথ সেনের কন্যা বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে। তাঁদের দাম্পত্য জীবন আটান্ন বছর ধরে সত্যই আনন্দের ভেতর দিয়ে কেটেছিল। তাঁর সহধর্মিণী ২৬ শে ডিসেম্বর তাঁকে রেখে চলে যান কিন্তু সেই ব্যথা দীনেশচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল যার জন্য তিনিও বেশীদিন এই মর্তভূমে থাকতে পারলেন না। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র বাংলা ও বাঙালীকে চিরকালের মত ত্যাগ করে পরলোক যাত্রা করেন কিন্তু তিনি যে অমূল্য সম্পদ জাতির জন্য রেখে গেছেন তার কথা বংশ পরম্পরায় বাঙালী জাতি ভুলতে পারবে না।

তাঁর শিক্ষকতার ফলে যে কত অনুসন্ধিৎসুর জন্ম হয়েছিল তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি জাতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদপীঠে বসে ও স্যার আশুতোষের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষার যে চর্চা করেছেন তার এক একটি দিক সুগভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে তখন মনে হবে বাঙালী কেবল শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করে ধন্য হয়েছে তাহা নয় তাদের ভাষা ও সাহিত্য জগতের কাছে চিরকাল শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বিশ্বে যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অভিষিক্ত করেছিলেন তার জন্য তিনি দীনেশচন্দ্রের কাছে ঋণী। তিনি বাঙালীজাতিকে দিয়ে গেছেন এক সামগ্রিক রসসম্ভার, তার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গ্রামীণ লোককবির কণ্ঠ থেকে রাজসভার শ্রেষ্ঠ কাব্যস্রষ্টাদের কণ্ঠস্বর।

দীনেশচন্দ্র ছিলেন একধারে কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর লেখনীর সংগে যাদের পরিচয় হয়েছে সেখানে এই মহান পুরুষের সাহিত্যের সর্ব ক্ষেত্রে কি অসাধারণ শক্তি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবনের একটি মুহূর্ত সময় বৃথা নষ্ট করেননি, যেন মনে হয় তাঁর গত জন্মের তপশ্চর্যার ফলে এ সম্ভব হয়েছে। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সকল ঘটটি পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে তিনি সমাজের অজ্ঞেয়, অপরিত্যক্ত ও অশ্রদ্ধা ভাজন জনগণের কথাগুলিকেও খুব যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ ও মুদ্রিত করে তাদের সাহিত্য সৃজনীশক্তি যে আত্মগোপন করেছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। যাদের ভদ্র সমাজ তুচ্ছ জ্ঞান করত সেই লোকদের কথা ও সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পেঁছে দিয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য লোককথায় যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে গ্রীম ভাতৃ-দ্বয় ও হ্যানস এনড্যারসনের নাম করা যেতে পারে। সেরকম দীনেশচন্দ্র বাংলার লোকসাহিত্যের সংগ্রহ করে আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের মনে এক সাহিত্য রসাস্বাদনের নতুন দিক খুলে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাঁরা ভারতীয় ভাবধারাকে জগতের কাছে পরিচিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যেমন স্যার উইলিয়ম জ্যোন্স, কথা সরিৎ সাগর অনুবাদক টনি ও পেনজার। পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদক ডাব্লু্উ রাইডার প্রভৃতি। এই সকল ব্যক্তিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে উচ্চশ্রেণী সংস্কৃত কথা সাহিত্যকে ইংরাজী ও ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত করে পূর্বে ও পশ্চিমের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র মৌখিক লোক গাথা, লোক গীত, লোককথা, উপকথা, রূপকথা ইত্যাদি অনুবাদ করে প্রাচী ও প্রতীচ্যের

নিকটে নিরক্ষর লোকদের ভাষা ও সাহিত্যের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি লোকসাহিত্য গ্রন্থে লিখেছেন, এক সময় বাংলা থেকে মধ্য প্রাচ্যে বাংলার প্রাচীন লোককথার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল দেশ দেশান্তরের মানুষ ও তার রূপে মুগ্ধ হয়ে এসেছিল বাংলার মাটিতে। এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য লাল-বিহারীদের নাম করা যেতে পারা যায়। তিনি বাংলার লোককথা পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে প্রচার করেছিলেন। এই লোককথাগুলি যেন গুপ্ত জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করেছে। প্রাচীন ভারতীয় জনগণের জীবন যাপন প্রণালীর ইতিহাস যাহা অজ্ঞাত ছিল তাহা যেন লোককথা মুকুরে উদ্ভাসিত হল। এর সঙ্গে মিশে আছে মানুষের পাথরের গাত্রে যে লিখন তাহা আজও প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদঘাটন করতে বা সমর্থ হলেন না তার পরিচয় পাওয়া গেল বংশপরম্পরায় প্রবাহিত মৌখিক লোক-সাহিত্যে লোকশিল্পের মাধ্যমে।

বাংলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী ফেলো হয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাহা আজও প্রতিটি লোক সাহিত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি স্মরণ করে। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বাংলার লোককথা প্রথম তিনি সংগ্রহ করে শিক্ষিত জনসমাজের দৃষ্টিগোচর করেন। এই লোককথাগুলির মধ্যে রূপমালা, কাঞ্চনমালা, মধুমালা, পুষ্পমালা ইত্যাদি গল্পের ভিতর যেমন আছে অপরূপ সৌন্দর্য, ভাষার ভঙ্গীমা ও কথার ঐন্দ্রজালিক মহিমা তেমন আর কোন উচ্চশ্রেণীর কথাসাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। এই লোককথা এক সময় হিন্দু শিশুদের কাছে এত পরিচিত ছিল যে সেগুলি ঠাকুমা ও দিদিমারা যখন নাতিনাতিনীদের বলতেন তখন তারা যেন অমৃত পান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য লোককথার প্রভাবে এই লোককথাগুলি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তার গণ্ডী কেবলমাত্র অশিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারা তাদের শিশু সন্তানদের লোককথা-গুলি শুনিয়ে লালন পালন করে এসেছে। যেমন লোকগীতের মধ্যেও এরকমটি দেখা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ যখন মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল কিন্তু তাদের মন থেকে প্রাচীন দেবদেবীদের মাহাত্ম্য গাথা, গান, ও মন্ত্র তন্ত্র অন্তর্হিত হয়নি। তারা ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্ব পুরুষদের পথ অনুসরণ করে এসেছে।

দীনেশচন্দ্র দেখিয়েছেন সারা বিশ্বের লোক সাহিত্য যেন একটি তন্ত্রীতে বাঁধা।

সরল সহজ মানুষের মন যেন একই সুরে ভিন্ন ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে ; এর তুলনা স্বরূপ দেখান যেতে পারা যায় লালবিহারীদের ফকিরচাঁদের গল্প শুনে যখন বাংলার পল্লীবাসীরা আনন্দ আস্বাদন করছে তখন সুদূর জার্মাণীর গ্রামীণ ব্যক্তিরা 'ফেথফুল জনের' লোককথা শুনে একই ভাবে বিহ্বল হয়েছে। লোক-কথার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় বহুলাংশে এ দু'টি কথার মধ্যে সবিশেষ মিল আছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি থেকে 'সোনার কাঠি' ও 'রুপার কাঠি' ঠিক অনুরূপ একটি লোক কথার দৃষ্টান্ত গেলিক গাথায় পাওয়া যায়।

বাংলার লোক সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসাবে দীনেশচন্দ্র সেনের নাম চিরকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর অবদান যে কত বড় তাহা না সযত্নে অনুশীলন করলে কাহাকেও বুঝান সম্ভবপর নয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' উদ্ধার হয়েছে। এই গীতিকাগুলির ভিতর ময়মনসিংহ গীতিকা সর্বকালের ও সর্বজনের মন জয় করতে পেরেছে। তাঁর এই বিরাট কাজে সাহায্য করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে মহাশয়। যখন দীনেশচন্দ্র লোক-সাহিত্য সংগ্রহ কাজে ব্রতী হন তখন তাঁকে উৎসাহ দেন স্যার আশুতোষ, লর্ড লিটন, ই, এফ, ওয়াতেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ। তিনি তখন থেকে পরোক্ষভাবে পরাধীন জাতির মনে নিজ দেশের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের দীপ শিখা জ্বালিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন। লোকগাথগুলির মধ্যে স্বাধীনতার জন্য ভুঁইয়া রাজাদের সংগ্রামের ইতিহাস তিনি সংগ্রহ করে মৃতজাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত করেন। বাংলার বার ভুঁইয়ারা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীর মসনদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেই কথাগুলি লোককবির সুললিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। বারভুঁইয়ার ভেতর পরাক্রমশীল ভুঁইয়া রাজা ঈশাখাঁ দিল্লীর সম্রাটের প্রেরিত দুর্ধর্ষ সেনাপতি সাহবাজ খান এবং মান সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক গাথা ও গানের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে রেখাপাত করত তাহা সাধারণ মানুষের মনে চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকবে। যেমন আজও চাঁদ রায় আর তাঁর ভাই কেদার রায় প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি। এই ঐতিহাসিক লোক গাথা থেকে বহু আভিজাত্য শ্রেণীর নাট্যকার বহুশত নাটক রচনা করে গেছেন কিন্তু এই গাথাগলির মধ্যে যে সুমধুর রসাধার ছিল উহা উচ্চ

শ্রেণীর নাটকের মধ্যে দেখা যায় না।

এই গাথা থেকে বাংলার সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর যে যোগাযোগ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে এক সময় বিরাট জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র ছিল। তার কথা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত লোককবি বংশীদাস তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত করেছেন। একদিন চাঁদ সওদাগরের জাহাজ দিগদিগন্ত সমুদ্র পারী দিত তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বেহুলার কাহিনীতে আছে। বাংলার লোক-সংস্কৃতি কেবলমাত্র বাংলাদেশে সীমিত ছিল তা নয় এর পরিব্যপ্ততা ঘটেছিল সুদূরে চীন, সিংহল, জাভা, বলিদ্বীপ ও আরব সাগরে বিধৌত সকল দ্বীপ ও উপদ্বীপে।

দীনেশচন্দ্রের পূর্বে লোক সাহিত্যের গভীর নিষ্ঠাভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষিত আর কেহ করেন নাই। কলকাতার বটতলায় মুদ্রিত সস্তাদরের পুস্তিকাগুলি যে জনগনের মনোরঞ্জন করত তাতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের লোকসাহিত্যের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। তাঁরা লোকসাহিত্যকে বাংলা সংস্কৃতির নিছক ভার হিসাবে দেখতেন কিন্তু দীনেশচন্দ্র সংস্কৃতির চালনি দিয়ে ঝেরে মুছে এর সুষ্ঠু স্বরূপটি উদ্ঘাটন করলেন। এখন লোকসাহিত্যের প্রতি বাংলাদেশের জনগণেরা বিশেষ সচেষ্ট হয়ে পড়েছেন; এবং এর অনুশীলন দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান পন্ডিতগণ দীনেশচন্দ্রের বহু ভুলত্রুটি দেখাচ্ছেন তাহা খুব গভীর পরিতাপের বিষয়। তাঁরা এই মহান ব্যক্তির প্রথম দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বিস্মরণ হন। তিনি যে ভাবীকালের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য যে পথ তৈরী করে গেছেন তার বিশেষভাবে যত্ন করে চললে বহু অবলুপ্ত লোকসাহিত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পদ
পট ও পটুয়া সঙ্গীত

পশ্চিম বাংলা ছাড়া আর অন্য কোন রাজ্যে পট ও পটুয়া সংগীত দেখা যায় না। এ হল পশ্চিম বাংলার নিজস্ব সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য। সভ্যতার চাপে ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যে নিষ্পেষিত হয়ে পট ও পটুয়া সংগীতের স্রষ্টারা বিলীন হতে বসেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গুরু সদয় দত্ত বীরভূম থেকে পট ও পটুয়া সংগীত বাঙালী সুধী-জনকে উপহার দেন। পশ্চিম বাংলার রাঢ় প্রদেশের পটুয়াদের আঁকা রঙিন ছবি সকলকে মুগ্ধ করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বীরভূমের পটুয়াদের বহু বিচিত্র দীর্ঘ পটগুলি যেমন আকর্ষণীয় তেমন পট সংগীতগুলি শিক্ষণীয়। পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পে পটুয়াদের দীর্ঘ গুটান চিত্র বহুল পট সমগ্র গ্রাম-বাসীদের মনোরঞ্জন করত। বীরভূমে পটুয়ারা যেমন এক সময় বহুজন সমাদৃত হয়েছিল তেমন কলকাতার কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা চিত্রপটগুলি কলকাতা বাসীদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল। পটুয়ারা বাড়ীবাড়ী ঘুরে পট দেখিয়ে দেবদেবী বিষয় পৌরানিক উপাখ্যানের গান গাইতেন। তাতে ছবির কথাটি দর্শকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করত। বর্তমান যুগে তারা প্রচলিত পেশা থেকে স্খলিত হয়েছে। লোক শিল্পকলার যাঁর বহু যুগ যুগ ধরে ধারক ও বাহন হয়েছিল তাঁরা সরকার ও শিক্ষিত লোকের অনমনীয় মনোভাবে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে।

পটুয়াদের আদিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে হয়ত সুদূর মিশর থেকে চিত্র লেখা পদ্ধতি ক্রমশঃ তাঁদের ভিতর সঞ্চারিত হয়েছিল। মিশরের মমির পোষাকে নানা রঙে বর্ণিত ঐন্দ্রজালিক হরফ লেখা হত। তারপর ভারতে যমপট-ব্যবসায়ীর কথা পাওয়া যায়। গুরু সদয় দত্ত তাঁর পটুয়া-সঙ্গীত গ্রন্থে লিখেছেন 'রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের পীড়ার কথা শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন শিকার হইতে ফিরিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দোকানের পথে অনেকগুলি কৌতূহলী বালকদ্বারা পরিবৃত একজন যমপাট্টিক বা যমপট-ব্যবসায়ী পট দেখাইতেছেন। লম্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে ধরিয়াছেন, ডান হাতে একটা শরকাঠি দিয়া চিত্র দেখাইতেছেন, ভীষণ মহিষারূঢ়

প্রেতনাথ প্রধান মূর্তি আরো অনেক মূর্ত্তি আছে। পশ্চিম বাংলার ভূমিজ আদিবাসীদের যাদুপটগুলি অতীত যমপটের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই যাদুপটগুলি এক একটি কাগজে আঁকা ছবির মতন।

সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় বাংলাদেশের পটুয়ারা সেই অতীত অজ্ঞাতনামা পট চিত্র শিল্পীদের বংশধর কারণ কেবল একটি জাতির ধমনীতে আবহমান কালের শিল্প যেন প্রবাহমান। সে যাই হোক বীরভূমের পটুয়া শিল্পীদের পরিচয় খুবই অত্যাশ্চর্য কারণ গুরুসদয় দত্ত তাঁদের উদ্ধৃত লোককথায় বর্ণনা করেছেন—

"বীরভূমের পানুড়িয়া গ্রামের বৃদ্ধ চিত্রকর ছবিলালের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে আমরা বিশ্বকর্মার পুত্রবাটি, আমরা বাঙ্গালীর ছেলে; কর্ম্মদোষে ছোট হয়ে পড়েছি। আমাদের একটি পূর্ব্বপুরুষ মহাদেবের বিনা হুকুমে তাঁর ছবি এঁকে ফেলেছিল, তাতে তাঁর ভয় হল যে মহাদেব হয়ত রাগ করবেন। তখন মহাদেব সে দিকে আসছিলেন। পাছে মহাদেব জানতে পারেন যে সেই ছবি এঁকেছে, সে জন্যে সে তাড়াতাড়ি ছবি আঁকার তুলিটি মুখের ভিতর পুরে লুকিয়ে দেয়। তাতে তুলিটি সকড়ি হয়ে গেল।

তখন মহাদেব বললেন তুলিটি সকড়ি কেন করলে?

সে বললে, ভয়ে।

মহাদেব বললেন, সে তুলিটা দূরে ফেলে না দিয়ে মুখে দিয়ে সকড়ি করে অন্যায় করেছে। তাই তিনি রাগ করে বললেন, তোরা এর জন্যে পতিত হ'লি। যা, তোরা ছোট হয়ে সমাজে থাকগে। তারপর সব জ্ঞাতিরা কাঁদতে কাঁদতে এসে মহাদেবকে বললেন—আমরা খাব কি করে তখন মহাদেব বললেন—তোরা হিন্দুও হবি না মুসলমানও হবি না। তোরা মুসলমানের রীত করবি আর হিন্দুর কর্ম্ম করবি অর্থাৎ ছবি আঁকিবি ও পড়াবি।

সেই থেকে আমরা মুসলমানদের মত নামাজ করি আর হিন্দুর মত দেব-দেবতার ছবি আঁকি ও সেই সব গান করি। আর আমাদের নামগুলি সব হিন্দুর মত—যেমন ভক্তি, হরেন্দ্র, নোঙ্গর, পঞ্চানন, সতীশচন্দ্র, গরীব, সমস্ত।

এ প্রচলিত তাঁদের জন্মের লোককথা খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয় কারণ পটুয়াদের ঐসলামিক ভাব অপেক্ষা পৌরাণিক ভাবে তাঁরা তন্ময় আঁকা ও গানের মাধ্যমে।

পশ্চিম বাংলার লোক সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পটুয়াগণ পটচিত্র ও পটসংগীত সৃষ্টি করে গেছেন তাহা সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরবের বস্তু। পটুয়াদের কণ্ঠে কি করে দীর্ঘ পৌরাণিক কাহিনী যোগাত তা শুনে আশ্চর্য হতে হয় কারণ তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর এবং শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ।

পটুয়াদের পটচিত্রগুলি বহু রঙে চিত্রিত। তাঁদের নানা বর্ণে রঞ্জিত ছবি-গুলি ঠিক রঙীন পর্দার মত এক একটি দৃশ্য বর্ণনা করছে তা দেখে দর্শক হতবাক হয়ে যায়। এই পটশিল্প দেখা যায় কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, বেহুলাপালা, দাতাকর্ণ পালা ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণলীলার ছবিতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভারবহন, পুতনা বধ, গোষ্ঠলীলা, তাড়কা বধ প্রভৃতি ছবিগুলি সত্যই অনবদ্য এবং বস্ত্রহরণ ছবিটিতে প্রেমরসের সৃষ্টির নবঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কয়েক-টি সংগীতের উদাহরণ থেকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মূল বিষয়বস্তুটি বোধগম্য হবে।

পটুয়াদের সংগীতগুলির আরম্ভে লৌকিক ছড়ার মত তাতে উপদেশ আছে যেমন 'কৃষ্ণের অবতার' পট গীতের বর্ণনায়—

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
গিন্নির পাপে গিরস্ত নষ্ট ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়॥

শনি-নিগ্রহ

মহারাজের দেশে দেখ জল নাইক হ'ল
রাজার প্রজাগণ কষ্ট পেয়ে পলাইতে লাগিল।
নারদ মুনি কইছে শুনেন মহাশয়
শনিকে বধিলে পরে তবে জল হয়।
রথ ঘোড়া পিড়া সারথি সাজিয়ে
মহারাজ শনিকে বধিতে চলিলেন।
যত তত মারেন বাণ শনির উপরে
কংস রাজার দেশে হরির নাম যেবা লিবে
হাতে বেড়ী পায়ে বেড়ী বক্ষ-স্থলে পাষাণ চাপ দিবে।

কংস শাসন-বসু-দৈবকীর প্রতি স্বপ্ন গর্ভবান

কোথা ছিলেন বসু-দৈবকিনী হরির নাম যে লিয়াছে।
শ্বেত মাছির রূপ ধারণ করে নারায়ণ দেখায় স্বপন

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

তোমার গর্ভে তিলেক দাওগা ঠাঁই ।
ছয় পুত্র হলরে বাপ কংস রাজা মেরেছে কাছিড়ে
এক পুত্র হয়ে কিবা ভাগ্য হবে ।
এক মাস দুই মাসে মায়ের হইল কানাকানি
তৃতীয় পঞ্চম মাসের সময় হল জানাজানি
দশ মাস দশ দিন মায়ের শুভ পূর্ণ হল
বসুমতী দাইমা হয়ে নিজে কৃষ্ণকে কোলে করে নিল ।
আঁওয়ালে জাঁওয়ালে দিচ্ছেন বসুদেবের কোলে
বসুদেব লুকাইতে চলল নন্দালয়ে নন্দ ঘোষের ঘরে ।

যমুনা পার-সন্তান পরিবর্তন

কৃষ্টকে দেখে যমুনা উথলে উঠিল
ভগবতী শৃগাল-মূর্ত্তি হয়ে যমুনা পার হল ।
দশ মাস দশ দিন ছিলেন মায়েরি উদরে
আমার গর্ভে চান করেন ঠাকুর ভাগ্য হোক মোর ।
এক কন্যা হয়েছে রাজা ভিক্ষা দাও মোরে
কিবা কন্যা কিবা পুত্র মারগা রজক-পাথরের উপরে ।
হাতে হাতে 'ভগবতী স্বর্গ' উড়ে গেল ।
আমাকে যে মেলি বেটা কংস দুরাচার
তোকে যে মারিবে বেটা গোকুলে আছে ঘর ।
একে ত রাজার ভগ্নী পুতনা স্তনে বিষ মেখে গমন করিল
সই সই বলে যখন সম্বন্ধ করিল
অন্তর যামিনী ঠাকুর সবই জানিল ।

পুতনা বধ

'কোহা' 'কোহা' করে যখন কেঁদে যে উঠল
দেখুন পুতনার কোলে দিল
এক চুমুক, দুই চুমুক, তৃতীয় চুমুকের বেলায় পুতনা বধ হল ।
পুতনা ম'ল ভালই হল শব্দ গেল দূরে ।
পুতনা পড়ে রইল চৌদ্দ ভুবন পর্ব্বত সমান জুড়ে
কৃষ্ণের জন্ম শুনে দেব দেবতাগণ বড় আনন্দিত হইল ।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র

গোকুলে গোপাল নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।
কি আনন্দ হলরে ভাই গোকুল নগরে
নন্দের ঘরে নন্দোচ্ছব
নন্দের মাথায় দধি দুগ্ধ ছানা মাখন ঢালিল।
খোল বাজে করতাল বাজে মৃদঙ্গ বাজে হাতে
বাকু মুরারি বাজে সখীগণের মুখে।
চারি ধারে সখীগণ মধ্যে শ্যামরায়

বস্ত্র হরণ

ঢলে ঢলে পড়েন দেখ রমণীদের গায়।
বৃন্দাবনের মধ্যে তরুলতা এড়ি বেড়ি যায়
ভোমরা ভোমরী তায় হরি গুণ গায়।
খেলা-রসে ছিলেন কানাই সুবলেরি সনে
হরিবে গোপীগণের বস্ত্র তাই পড়ে গেল মনে
বস্ত্র দাও ঠাকুর পরিধান করি
শুকনো বস্ত্র পরে বুঝি নাম রাখিব কালী।
কালী কালী বলিস্ নাগো শুন গোয়ালার ঝি
বিধাতা করেছেন কালো আমার সাধ্য কি ?
বস্ত্র যদি না দিয়ো ঠাকুর যাব কংসরাজার ঠাঁই
কংসেরি তাপে ঠাকুরের জাতি কুল নাই।
বারে বারে দিস্ না তোরা কংসের তুলনা
অবোধ কালে বধেছিলাম কংসের ভগিনী পুতনা।
গাছ হতে নাম ঠাকুর পেড়ে দাও ফুল
ডাল ভেঙ্গে পড়ে মরবে শূন্য হয় গোকুল।
ডাল বেড়ি যখন বস্ত্র পেড়ে দিল
দৌড়াদৌড়ি করে সখীরা তখন নগরে চলে গেল।
সাজ সাজ ব'লে বড়াই নগরে দিলে সাড়া
বড়াই বুড়ীর বার্তা পেয়ে নগরে দিল সাড়া।
কেউ করলে রস-বিল্যেস কেউ সাজলেন দধির পশরা
নন্দ গেল বাথানে যশোদা গেলেন জলে

খালি ঘর পেয়ে দুষ্ট ছেলে ননী চুরি করে
নন্দরাণী দেখতে পেয়ে বান্ধেন যুগল করে
বেঁধো না মা নন্দরাণী বন্ধন জ্বালায় মরি
হাতেরি মুরারি বেচে দিব ননীর কড়ি।
সখীরা বলে আমরা যে মথুরা যাব ভার কে বয়াবে।
জগদীশ্বর হরি আছেন তিনি ভার বয়াবেন।
শুভ শুবন্যার ভার দিলেন বেলল্যা পাটের শিকা
কৃষ্ণের কাঁধে লয়ে ভার চলিলেন রাধিকা।
ঠাকুর বললেন আমি ত ভার বয়াই নাই জগতেরি সার
শ্রীরাধিকার প্রেমের জন্য কান্ধে বয়াই ভার।
জলে কৃষ্ণ থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমন্ডলে
একা কৃষ্ণ নাম ধরেন জগত সংসারে।
বড় ঘর, মা, বড় দুয়ার, বড় কর আশা
সকল দর্ব্য পড়ে রইবে গঙ্গার তীরে বাসা।

[বালিয়া নিবাসী ত্রিলোকতারিণী চিত্রকরের গান]

পটুয়া সংগীতে পটুয়াদের পালা সংগীত যেমন বেহুলা পালা, গোবিন্দ মঙ্গল দাতাকর্ণ পালা ইত্যাদি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পট দর্শকদের কাছে এগুলি খুবই উপভোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরকম একটি পালার পরিচয় দেওয়া হল।

দাতাকর্ণ পালা

বৈশান বলেন শুন শুন জন্মেজয়।
মহাভারতের কথা শুন মহাশয়॥
একদিন বাসুদেব ভাবিল অন্তরে।
কর্ণ যে কেমন দাতা বুঝিব তাহারে॥
যে যাহা মাগেন কর্ণ তাহা দেয় দান।
সবে বলে দাতা নাই কর্ণের সমান॥
এই কথা মনে মনে ভাবে নারায়ণ।
মায়া করে হৈল এক বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ॥
অতি বৃদ্ধরূপ হইল দুই চক্ষু অন্ধ।
কর্ণকে ছলিতে গেল আপনি গোবিন্দ॥

চলিতে শকতি নাই কাঁপে থর থর।
কর্ণের নিকট গেল প্রভু গদাধর ॥
দ্বারীকে ডাকিয়া বলে শুন চক্রপানি।
মোর সমাচার কর্ণে জানহ এক্ষুণি ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়ে দ্বারী ভয় হোল চিতে।
কর্ণকে চলিল দ্বারী সমাচার দিতে ॥
প্রণাম করিয়ে দ্বারী জোড়হস্তে কয়।
দ্বারে এক বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ মহাশয় ॥
ব্রাহ্মণের নাম শুনি কুন্তীর নন্দন।
অতিশীঘ্র আইলেন যেখানে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়ে কর্ণ পরম আদরে।
গলায় বসন দেয় জোড়হস্তে কয়।
কোন কার্য্যে আগমন কিবা আজ্ঞা হয় ॥
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ হও সাবধান।
লোক মুখে শুনি তুমি বড় পুন্যবান্ ॥
কাল করিয়াছি আমি ব্রত একাদশী।
পারনা বরাহ কর্ণ আছি উপবাসী ॥
আর এক আছে মোর মনের বাসনা।
মাংস বিনে নাহি হয় ব্রতের পারনা ॥
কর্ণ বলে দ্বিজবর মনস্থির কর।
আনিব প্রচুর মাংস যত খেতে পার ॥
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কিবা দিতে পার ॥
তবে-ত কহিব আগে অঙ্গীকার কর ॥
কর্ণ বলে অঙ্গীকার অন্যথা না হব।
যে মাংস খাইতে চাও তাহা আনি দিব ॥
বৃষকেতু নামে আছে তোমারি নন্দন।
তাহা কাটি দাও মাংস করিব ভোজন ॥
পিতা মাতা দুইজনে কাটিয়ে করাতে।
রন্ধন করিয়া দিবে আমার সাক্ষাতে ॥

কাতরে কাটিয়া দিলে ঘুরে যাব ঘর।
অভুক্ত ব্রাহ্মণ যেন ক্ষুধ বৈশ্বানর ॥
হেঁট হইল মাথা কর্ণ এই কথা শুনে।
সর্বনাশা হোল বুঝি মনে মনে জানে ॥
বিরস বদন কেন পদ্মাবতী কহে।
মুখে নাই বাক্য সরে চক্ষে ধারা বহে।
কোথা হতে এল এক অবোধ ব্রাহ্মণ।
বড় নিদারুণ কথা কহে সেই জন ॥
পদ্মাবতী বলে নাথ কি বলিব আর।
এ-কথা শুনিয়া বুক বিদরে আমার ॥
কর্ণ বলে এই কর্ম যদি না করিবে।
অঙ্গিকার ভঙ্গ হলে নরকে পড়িবে ॥
অঙ্গীকার কর তুমি কি কর তোমারে।
এক মনে করাত ধরে কাটিব বাছারে ॥
হেন কালে দ্বিজবর ডাক দিয়ে কয়।
শীঘ্র করে এস কর্ণ বিলম্ব না সয় ॥
অঙ্গীকার করিয়াছ শুন কর্ণ ভাই।
বল যদি পারিব না গৃহে চলে যাই ॥
এত শুনে পদ্মাবতী সকাতরে কয়।
অঙ্গীকার করিয়াছ না দিলেও যে নয় ॥
হাসিয়া কাটিব পুত্র খাবার ব্রাহ্মণে।
এ যশ থাকিবে যে এ তিন ভুবনে ॥
যোড়হস্তে বৃষকেতু স্তুতি আরম্ভিল।
ব্রাহ্মণের পদধূলি সর্বাঙ্গে মাখিল ॥
গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে কৌতুকে।
রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম লিখে একে একে ॥
গোবিন্দ চরণ শিশু করিয়ে স্মরণ।
তিলার্ধ নাইক ভয় সহাস্য বদন ॥
হাসিয়ে করাত দোঁহে হাতে করে নিল।
ধন্য ধন্য করে বিপ্র হাসিতে লাগিল ॥

করাত বসায়ে তবে পুত্রের মাথায় ।
আনন্দে বসিয়া শিশু কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
করাতে কাটিয়া মাথা ফেলে ভূমিতলে ।
কাট মুণ্ডু উচ্চৈস্বরে রাধাকৃষ্ণ বলে ॥
কাটিয়ে পুত্রের মাথা রন্ধন করিয়ে ।
পদ্মাবতী পুত্রের মুণ্ড রাখিলা লুকায়ে ॥
পদ্মাবতী বলে দ্বিজ যাইবে যখন ।
বাছার মস্তক লয়ে করিব ক্রন্দন ॥
অন্তরে জানিল তাহা ভকতবৎসল ।
ঐ-মুণ্ড দিয়ে পুনঃ রাঁধাহ অম্বল ॥
অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধি কর্ণ যোড় করে কয় ।
ভোজন করিতে শীঘ্র আসুন মহাশয় ॥
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ শুনহে শ্রীহরি ।
অম্বল বিহনে অন্ন খাইতে না পারি ॥
অম্বল রাঁধিয়া দেহ কর্ণ মহাশয় ।
ভোজনে আমার তবে বড় তৃপ্তি হয় ॥
কর্ণ বলে কিবা দিয়ে রাঁধিব অম্বল ।
একখানি মাংস নাই রেঁধেছি সকল ।
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ বলি তব কাছে ।
পদ্মাবতী পুত্রের মুণ্ড লুকায়ে রেখেছে ।
সেই মুণ্ড দিয়ে পুনঃ রাঁধই অম্বল ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি শুন কর্ণ ভাই ।
অন্ন ব্যঞ্জন তুমি কর এই চারি ঠাঁই ॥
আর এক কর তুমি হয়ে সাবধান ।
নগর হইতে এক শিশু ডেকে আন ॥
ব্রাহ্মণের কথা কর্ণ না করে হেলন ।
জয় আজ্ঞা বলিয়া তখন করিলা গমন
পুত্রের শোকে মহারাজ চারিদিকে চায় ।
হেন কালে নিজপুত্র দেখিবারে পায় ॥

ব্যাকুল হৈয়া রাজা পুত্র নিল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥
বিদায় হৈল রাজা ভাবে মনে মন।
দ্বিজবেশে ছলিবারে এল কোন জন ॥
কর্ণ পদ্মাবতী দোঁহে যোড় করে কয়।
অপরাধ ক্ষমা কর দাও পরিচয় ॥
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ না চিন আমারে।
আপনি আইনু কৃষ্ণ ছলিবার তরে
কর্ণ বলে তুমি ওগো ব্রহ্ম সনাতন।
কৃপা করি নিজ মূর্তি করাও দরশন ॥
কর্ণকে করিয়া দয়া দৈবকী নন্দন।
নিজ মূর্ত্তি দেখাইলেন প্রভু নারায়ণ ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কর্ণ হেরিয়ে নয়নে।
প্রেমে গদ-গদ হয়ে পড়িলে চরণে।
যে পদ করেন ধ্যান আপনার মনে।
হেন কৃষ্ণ আইলেন আমার ভবনে ॥
ধন্য ধন্য কর্ণ তুমি বলে ভগবান।
বৈকুণ্ঠবাসী হরি হৈল অন্তর্ধ্যান ॥
এই পালা যেই জন করায় শ্রবণ ॥
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ খণ্ডন ॥
এইখানে দাতাকর্ণ পালা হল সায়।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী হয় যে জন গাওয়ায় ॥

এই পালার সঙ্গে পটগুলি দর্শন করে ভক্তি রসে দর্শকরা তন্ময় হয়ে পড়ে। নিরক্ষর পটুয়াদের কন্ঠে ও শিল্পে ভাব ভক্তির সমন্বয় কি করে ঘটল তা দেখে হতবাক্ হতে হয়। এই শিল্প পুনরুজ্জীবিত হলে পৌরানিক উপাখ্যানগুলি রক্ষা পাবে।

বাংলার লোক সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ

ধাঁধা লোক সাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে হয়ত মানুষের জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কথা বলার পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছিল তেমন ঘুরিয়ে কথা বলার রীতি তাঁরা রপ্ত করেছিলেন। অতীত হেলেনিক, সেমেটিক এবং বৈদিক সংস্কৃতির যুগে ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়। মানুষ যতই সভ্য হতে লাগল তাঁরা ধাঁধাকে চিত্ত বিনোদনের মধ্যে ধরে নিলে। কর্মক্লান্ত গ্রাম্য মানুষেরা সন্ধার সময় গাথা, লোককথা, প্রবাদ ও ধাঁধা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সময় কাটাতেন। তখন তো বিজ্ঞানের হুড়োহুড়ি ছিল না যে রেডিও, টিভি, সিনেমা বা অন্য আনন্দ বিনোদনের সংস্থা তাঁদের হাতের কাছে ছিল! তাঁরা কেবলমাত্র হাসাহাসির মধ্যে ধাঁধা ও কথা আর গীত নিয়ে আনন্দ উজ্জ্বলভাবে নিজেদের পরমায়ু বৃদ্ধি করতেন। পাশ্চাত্য ফোকলোর পণ্ডিতগণ যেমন এল ডাব্লুই চ্যাপপেল বলেছেন 'Riddles, perhaps even more than most types of traditional lore, have a way of 'staying put'. Their vigorous compactness of form seems to give them a peculiar hold on the popular in agination and in many cases to insure their preservation for centuries. "অর্থাৎ ধাঁধা সম্ভবত বংশ পরম্পরাগত কথার ক্ষণিকের জন্য পথরুদ্ধ করেছে। তার কল্পনা এতই নিবিড় এবং জনপ্রিয় ছিল যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চিন্তার সঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। মরিস ব্লুমফিল্ড নিম্নস্থ একটি শিশুদের ব্রাহ্মণীয় ধাঁধার (Brahmanical riddles) উল্লেখ করেছেন :—

There was a little green house,
And in the little green house,
There was a little brown house,
And in the little brown house,
There was a little yellow house,
And in the litile yellow house

There was a little white house,
And in the little white house,
There was a little heart.

এই ধাঁধাগুলি গোলক ধাঁধার মত। হয়ত মানুষের দেহের মধ্যে যে অন্তঃকরণ আছে তার হয়ত বর্ণনায় বিবৃত করা হয়েছে। ব্লুমফিল্ড বলেছেন এ যেন আখরোটের মত কঠিন ফল সহজে ভাঙ্গা শক্ত। সেজন্য এই ধাঁধার নাম দিয়েছেন 'Cracking riddles' তিনি আরও বলেছেন 'From olden times, as an early exercise of the primitive mind, in its adjustment to the world about it, comes the riddle."

অর্থাৎ অতীত কালে, আদিম লোকেরা পৃথিবীর সঙ্গে নিজেদের মনকে সংযুক্ত করার জন্য ধাঁধার বা হেঁয়ালীর আশ্রয় নিতেন। স্যার জেমস ফ্রেজার দেখেছিলেন কোন কোন আদিবাসী নির্দ্দিষ্ট সময় ও অনুষ্ঠান ছাড়া ধাঁধা বলতেন না। অতীতযুগে ব্যাবিলনে ধাঁধা পাঠ্য পুস্তকের তালিকা ভুক্ত ছিল। সাঁওতাল আদিবাসীরা ধাঁধা বলবার পূর্বে 'কুদুস কুড়িৎ কুড়িৎ' অর্থাৎ 'চিল চিল হেঁয়ালি' এ কথাটি বলে হেঁয়ালি বলা শুরু করে, তাদের ধারণায় চিল যেমন কোন কিছুর উপর ছোঁ মারে, হেঁয়ালিও সে রকম মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির উপর ছোঁ মারে। বুদ্ধি ও বিচার শক্তি উপর তখন প্রচন্ড চাপ পড়ে। তেমন ইংরাজী একটি ধাঁধায় মাইকেল স্পার্ক তাঁর পুস্তক 'The Books of Meery Riddles (1600 and 1686) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ধাঁধাতে মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে। তাঁর গ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

In the wit quicke ?
Then do not sticke
To read these riddle darke
Which if thou doe,
And rightly too,
Thou art a witty sparke.

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ওল্ডটেসটামেন্ট গ্রন্থে ধাঁধা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জাপানীদের মধ্যে ধাঁধা লড়াই আছে। প্রথম দল বলেন kanawaya বা কানওয়া বলে ধাঁধা বলা সুরু করেন। পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ধাঁধা বলে

আনন্দ উপভোগ রীতি দেখা যায়। ভারতে বৈদিক যুগ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধাঁধায় জিজ্ঞাসা ও উত্তর দিবার রীতি ছিল। কথা সরিৎ সাগরে, মহাভারতে এবং বৌদ্ধ গান ও দোহা গ্রন্থে ধাঁধার নানা রকম লোককথার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে এ সকল ধাঁধা বৃহৎ আলোচনা করতে গেলে ধাঁধার মহাভারত সৃষ্টি হবে। সেজন্য সংক্ষেপে বাংলার কয়েকটি ধাঁধার আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকা যুক্তি সংগত। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

(১) বিধাতা নিৰ্ম্মাণ ঘরে নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বসে নিরাহার।।
যখন পুরুষবর হয় বলবান্।
বিধাতার সৃজন ঘর করে খান খান।। উত্তর ঃ ডিম

(২) হিঁয়ালী প্রবন্ধে পন্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি।। উত্তর ঃ ঘুড়ি

(৩) মরিলি জীবন পায় হতাশ পরশে।
বুঝহে পন্ডিত ভাই সভা মাঝে বৈসে।। উত্তর ঃ উনুন

(৪) বুঝিয়া চলিয়া বার্ত্তা দেয় আসি কানে।
বীরের কিংকর নহে বুঝহ সিয়ানে।। উত্তর ঃ মশা

(৫) চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুম খায় মুখে।। উত্তর ঃ হুঁকা

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে ধাঁধার বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যেমন 'নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতিশক্ত।
আবেশে আহার করে মানুষের রক্ত'।। উত্তর 'চিন্তানল'

আমাদের গ্রামীণ ছড়াগুলি সন্ধার সময় গ্রামবাসীদের খোড়াক যোগাত কয়েকটি ছড়ার উদাহরণ দেওয়া হল :—

(১) তিন অক্ষরে নাম যার সর্ব্বঘরে আছে।
পাছের অক্ষর ছাড়ি দিলে কেহ না যায় কাছে।।
আগের অক্ষর ছাড়ি দিলে সর্ব্বলোকে খায়।
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে রাম গুণাগুণ গায়।। উত্তর ঃ বিছানা

(২) রক্তে ডুবু কাজলের ফোঁটা

এক কথায় যে বলতে পারে
সে মজুমদারের বেটা। উত্তর ঃ কুঁচ

শিশুদের বুদ্ধি যাচাই করার জন্য বহু ছড়া আছে তার কয়েকটি যেমন

(১) কোন মাছের মাথা নেই—কাঁকড়া (২) কোন পাখীর ডিম নেই—বাদুর

প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যেমন—

(১) একটু খানি গাছে।
রাঙা বৌটি নাচে।। উঃ লংকা

(২) বন থেকে বেরুল টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।। আনারস

(৩) বন থেকে বেরুল হাতী বাঁশ ঘারে করে।
ফলটির ভিতর ফুলটি আছে কাটব কেমন করে।। চালতা

(৪) রাজার বাড়ির পাতি হাঁস।
খায় খোলা তার ফেলে শাঁশ।। চালতা

(৫) কাল গরু কালু শিরে দুধ দেয় সাত সেরে।
যখন গরু মনে করে একশ নদী এক করে।। বৃষ্টি

(৬) লাল বিবি ওড়না গায়।
চল বিবি ঢাকা যাই।।
ঢাকা গিয়ে ফল খাই।
সে ফলের বোঁট নেই।। উঃ মুসুর ডাল

(৭) লতা লতিয়ে লতিয়ে যায়।
সর্বাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোঁখের মাথা খায়।।
উঃ ধোঁয়া।

পশ্চিম বাংলার প্রতিটি জেলায় তার নিজস্ব ধাঁধা আছে হয়ত এক জেলার সঙ্গে অন্য জেলার ধাঁধার মিল পাওয়া যাবে কিন্তু ভাষার পার্থক্য থাকতে পারে। ধাঁধাকে পন্ডিতেরা নানা ভাবে ভাগ করেছেন সাংসারিক, প্রাকৃতিক ইত্যাদি যে পরিস্থিতে যেরকম প্রয়োজন হয় মানুষ সে রকম ধাঁধা ব্যবহার করেন।

মানুষের কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে প্রবাদের সৃষ্টি যেমন 'কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না' সংস্কৃতও পাই 'কয়লা শত ধোতেন ময়লা ন মুঞ্চতি' ইংরাজীতে 'Coal never change its hue'. এরকম কতশত প্রবাদ বাক্য আছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রবাদের সঙ্গে যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নাম জড়িত আছে তাঁদের মধ্যে সলোমন, সক্রেটিস, প্লেটো এবং কেটো প্রধান। বিশেষজ্ঞদের মতে 'Like all Folk-lore materials, a proverb has many traditional variations, which are all of equal authority অর্থাৎ সকল ফোকলোর উপকরণের মত প্রবাদের একটি কিংবদন্তী আছে যা অনেক রকম ভাবে এবং যারা সর্বত্রই সমান ভাবে

প্রতাপশালী। প্রবাদ কখনও উচ্চনৈতিক মনের ভাব প্রকাশ করে যা প্রতিদিন ঘটে তার থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে। আর্চার টেলার বলেছেন 'In literature proverbs are often used to characterize of a figure or to summarize neatly a situation.' অর্থাৎ সাহিত্যে প্রবাদ সাধারণত কল্পনার বিশেষ প্রকৃতি বা ভাব প্রদান করে কিংবা সুষ্ঠুভাবে পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে। প্রবাদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) Epigram বা রসাত্মক বাক্য সম্বলিত প্রবাদ যেমন ইংরাজীতে আছে "England is the paradise of women, the hell of horses, and the purgatory of servents." অর্থাৎ ইংলণ্ড নারীদের স্বর্গ, ঘোটকদের নরক ও দাসেদের পাপস্খালক। The Calf (Parchment), the goose (the pen), and the bee (wax or seal) the world is ruled by these three. অর্থাৎ বাছুর (চামড়ার কাগজ), হাঁস (কলম) এবং মৌমাছি (মোম বা সীল) এই তিনটি পৃথিবী শাসন করে, ইত্যাদি (খ) Medical Proverb বা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রবাদ যেমন ইংরাজীতে পাওয়া যায় (১) After dinner rest a while, after supper walk a mile অর্থাৎ দিবসের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর রাত্রের আহারের পর এক মাইল ভ্রমণ কর'। (২) An apple a day keeps the doctor away অর্থাৎ দিবসের একটি আপেলে চিকিৎসককে দূরে রাখে। ইত্যাদি (গ) Weather proverbs বা আবহাওয়া সম্বন্ধীয় প্রবাদ যেমন (১) April showers bring May flowers অর্থাৎ এপ্রিলের বর্ষা মে মাসে ফুল ফুটায় (২) March comes in like a lion and goes out like a lamb অর্থাৎ মার্চ মাসে সিংহের মত আসে মেষ শাবকের মত পলায়ন করে। ইত্যাদি (ঘ) Metaphor বা অলংকার বা উপমা সম্বলিত প্রবাদ যেমন (১) The darkest hour is just before dawn অর্থাৎ তমসা প্রত্যূষের আভাষ দেয়। (২) Every cloud has a silver lining অর্থাৎ প্রতিটি মেঘে রজত রেখা আছে ইত্যাদি (ঙ) Legal proverbs বা আইন ঘটিত প্রবাদ যেমন Ignorance of the law excuses no man অর্থাৎ আইন অনভিজ্ঞতার কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করে না। (২) A fair exchange is no robbery অর্থাৎ সুদ আদান প্রদান ডাকাতি নয়। ইত্যাদি। বাংলায় বহু চলতি প্রবাদ আছে যেমন

(১) জন জামাই ভাগনা। তিন নয় আপনা ॥	(২) সাপ শালা জমিদার তিন নয় আপনার

(৩) কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা ॥

(৪) যদি চলে মনিহারি।
কি হবে জমিদারী ॥

(৫) নেংটার নেই বাটপারের ভয়

(৬) বিষে বিষক্ষয়

(৭) জহুরী জহর চেনে

(৮) গরু মেরে জুতো দান

(৯) সাপ মরবে লাঠিও ভাঙবে না

(১০) ধান ভানতে শিবের গীত

এক একটি ক্ষেত্র বিশেষে এক একটি প্রবাদ বলা হয়। বাংলা দেশে হাজার হাজার প্রবাদ আছে প্রত্যেকটি প্রবাদের চরিত্র ভিন্ন প্রকারের। ডঃসুশীল কুমার দে ৯১০০টি প্রবাদ সংগ্রহ করে 'বাঙলা প্রবাদ' নামে গ্রন্থটিতে সংকলন করেন। তিনি বলেছেন প্রায় অনেক বাঙলা প্রবাদই স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক ঝাঁঝালো রসিকতার আমেজ আছে কিন্তু সকল প্রবাদই যে রঙদার হইবে এনন নয়; এবং অনুপ্রাস মিল প্রভৃতি ইহাকে লোকপ্রিয় করিলেও এগুলি প্রবাদের অপরিহার্য অংগ নয়। প্রাচীন প্রথম বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম মর্টন তাঁর পুস্তকে 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ'। ছড়া ও প্রবাদ প্রসঙ্গে উদাহরণ সহ দীর্ঘ আলোচনা পাই ডঃ সুকুমার সেনের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক সাহিত্য গ্রন্থে'।

পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা

বাংলা লোক সাহিত্য চর্চায় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা' খ্যাতিলাভ করেছে এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ব্যক্তিগণ অবহিত আছেন। গীতিকায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবদান আছে কিন্তু এবিষয়ে যথাযথ আলোচনা অল্পই হয়েছে। বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি পাঠকের দৃষ্টিতে আনা হচ্ছে। বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে যে আলোচনা যা ইতিপূর্বে হয়েছে আমার এই নিবন্ধটি তারই একটি সংহত কিন্তু সংক্ষিপ্ত প্রয়াস। কোন তরুণ গবেষক এ নিয়ে গবেষণা করলে লোকসাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ উদ্ধার হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

বহুযুগ ধরে পশ্চিমবঙ্গে গীতিকা বা গাথা চলে আসছে। দেখা যায়, অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পালরাজাদের রাজত্বকাল অপভ্রংশ ভাষায় গীত ও গাথা রচিত হয়েছিল। তারপর সেন রাজত্বকাল অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সাধারণ মানুষের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং বহু গ্রাম্য কবিকে গীতিকা বা গাথা রচনা করার প্রেরণা দিয়েছে। গীতিকা বা গাথা সাধারণত অশিক্ষিত কবিদের মৌখিক রচনা। গ্রাম্যকবি বা গায়েনগণ গাথা জন সাধারণের মনোরঞ্জন করার জন্য রচনা ও গীত করতেন সাধারণত একতারা দোতারা, সারিন্দা বা গোপীযন্ত্র ছিল গাথা বা গীতের সঙ্গী। সপ্তাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ পর্যন্ত গীতিকা বা গাথাগুলি গ্রাম্যসমাজে প্রভাব বিস্তার করত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর প্রচলন কিছুটা কমে যায়। শ্রীচৈতন্য ও তৎপরবর্তীযুগে পল্লীর জনগণ স্বাভাবিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃত্রিম আনন্দে নিমগ্ন হয়েছিল যার ফলে সেই সময়ে প্রাচীন গাথা কাহিনীকে বিভিন্ন কেচ্ছা 'গাথা' আকারে পাওয়া যায়। এর পরবর্তী সময়ে যদি প্রাচীন গাথাগুলি লিপিবদ্ধ না হত তা হলে লোকসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ধারা চিরকালের জন্য শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যেত। বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত গাথাগুলি গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। বিংশশতাব্দীতে

গ্রাম্যগাথাগুলির প্রচলন একেবারে বন্ধ হয়ে কেবলমাত্র পুঁথিতে লোকসাহিত্যের এই ধারাটি গ্রাম্য কুটিরে বিরাজ করতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৮৭৮ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (প্রথম ভাগ ৩নং) জি, এ, গ্রীয়ারসন 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে একটি বাংলা প্রাচীন গাথা দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। গ্রীয়ারসন সাহেব রংপুর গ্রাম থেকে লোকমুখে শুনে এই গাথা সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর থেকে অবলুপ্ত প্রায় প্রাচীন বাংলা গাথা বাংলা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ গ্রাম্য জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাচীন গাথাগুলি সংগ্রহ করে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উধৃত করে বলা যেতে পারে—"গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক জীবন সুখ সম্ভোগের আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে, তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা-আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্যহিসাবে গ্রহণ করতে গেলে তাহার সংগে সংগে মনে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়, তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্যসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবি গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে, সেইজন্যই বাঙালীর কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।" ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা' বহুদিন ধরে লোকসাহিত্য অনুরাগীদের পিপাসা নিবারণ করছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন লোকসাহিত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি 'পশ্চিমবঙ্গ গীতিকার' কথা পৃথকভাবে চিন্তা করেননি কিংবা তা প্রকাশ করার জন্য যত্নবান হননি যদিও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত গাথাগুলির সংখ্যা খুব অল্প নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গাথার মধ্যে থেকে বহু তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ গীতিকার অপ্রতুলতা অনুভব করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশে মনোভাব দেখাননি তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এসিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্বভারতী এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রন্থাগার খুঁজলে যে সকল পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাবে তাতে পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা গ্রন্থের ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কেবলমাত্র লোকসাহিত্যসেবী অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা'র কিঞ্চিৎ আলোচনা করে লোকসাহিত্য অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। পশ্চিমবঙ্গে যে কয়েকটি গাথা সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'সখীসেনা বা সখীসোনা' কিংবা 'শশিসেনা' 'দামিনী চরিত্র' 'মধুমালতী' 'সাঁওতাল বিদ্রোহের গান' 'গোপীচন্দ্রের গান' 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' 'মানিকচন্দ্রের গান' 'গোপীচন্দ্র নাটক' (পুঁথিটি বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গাথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে পশ্চিমবঙ্গ গীতিকার ওপর আকর্ষণ আসবে বলে মনে করি।

(১) সখীসোনা-রচয়িতা ফকীররাম কবিভূষণ।

'সখীসোনা বা শশীসেনার' গীতিকা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের ঠাকুরদাদার ঝুলির পুষ্পমালার সঙ্গে বিশেষ মিল আছে। এক সময় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এই গীতিকাটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। কাহিনীটি ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ২ খণ্ডে উল্লিখিত আছে।

সখীসোনা রাজকুমারী। তিনি কোটালের পুত্রের সহিত এক গুরুর পাঠশালায় পড়িতেন। একদিন সখীসোনার হাতের কলম ভূমিতলে পড়িয়া গেলে রাজকন্যার অনুরোধে কোটাল পুত্র সেটি তুলিয়া দিলেন। কিন্তু বিনিময়ে কোটাল পুত্র রাজকন্যার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি চাহিয়া লইলেন যে, তিনি (কোটাল পুত্র) যাহা বলিবেন রাজকন্যাকে তাহা পালন করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটিল। তৃতীয় দিন যখন রাজকন্যার কলম হস্তচ্যুত হইল তখন কোটাল পুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কোটাল পুত্রের এই অভিপ্রায় রাজকন্যার দম্ভে আঘাত হানিল। তিনি বলিলেন

জলে থাকি কুম্ভীর সহিত কর বাদ।
বামন হয়্যা চাঁদে হাত দিতে কর সাধ ॥
কোন লাজে কোঙর কহিলে হেন কথা।
রাজাকে কহিয়া তোর কাটাইব মাথা ॥

তখন কুমার উত্তর করিলেন—

আশা পায়্যা ভাষা কথা কহিলাঙ তোরে
যে হল্য সে হল্য গুণা মাপ কর মোরে।
তোরে হেন বচন বলিব নাই আমি।
সত্য বন্দী থাকিলে হইবে অধোগামী ॥

এই বলিয়া কুমার রামায়ণ হইতে সত্যরক্ষার আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন।

কুমারের এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা আপন দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সত্যভঙ্গ অপরাধের ভয়ে কুমারকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মনে মনে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইবার সময় গুরুদেবকে বলিলেন—

কহিয় কহিয় গুরু জননীর ঠাঁঞি।
তোমার কন্যার সনে আর দেখা নাই ॥
এই কথা আমার পিতার কাছে বল্য।
তোমার সাধের কন্যা শশীমুখী মল্য ॥
কান্দিলে প্রবোধ কর্য বুঝায়্যা সাদরে।
গিয়াছে তোমার কন্যা শ্বশুরের ঘরে ॥
কন্যা লইয়া চিরদিন কেবা করে ঘর।
আপনার কন্যা যেবা সেহ হয় পর ॥

গুরুকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিয়া রাজকন্যা সখীসোনা কোটাল পুত্র স্বামীর সহিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

এই খবর রাজবাড়ী পেঁাছিলে রাজপুরীর সকলে সখীসোনার শোকে অধীর হইল।

ধুলায় লোটায়্যা কান্দে এক শত রাণী।
গড়াগড়ি চলিল কঙ্কন বুকে হানি ॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া কান্দে হাতিশালে হাতী।
মৃগ পক্ষী ভুজঙ্গ ধরিতে নারে ছাতি ॥

রাজকন্যা রাজ্য ত্যাগ করিবার সময়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পথে বৎসহীনা গাভীর দর্শনে তাঁহার মন মায়েদের কথা মনে করিয়া আকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন।

শতেক মাত্তর আমি অন্ধলার নড়ি।
আমি হৈতে মা সব হইল আঁটকুড়ি ॥

এইভাবে পথে যাইতে যাইতে রাজকন্যা শশিমুখী ও কোটাল পুত্র অনেক বিপদের মধ্যে পড়িলেন এবং সখীসোনার বুদ্ধিমত্তা ও সতীত্বের জোরে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে উভয়ের পুনরায় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন ও মিলনে গাথার সমাপ্তি।

(২) চন্দ্রমুখীর পুঁথি-রচয়িতা খলিল

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সকল গীতিকা পাওয়া গেছে তার মধ্যে চন্দ্রমুখী প্রাচীন জনপ্রিয় গাথার মধ্যে একটি। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর ইসলামি বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন বাংলা হরফে যে পুঁথিটি পাই তাতেও ভণিতায় খলিলের নাম এবং রচনাকাল ১৩২৪ সাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা পুঁথি নকল করিবার তারিখ, রচনার তারিখ নহে। কাহিনীটি উদ্ধৃত করা হল—

"মিছির নগরের রাজা পুরুবেশ্বরের পুত্র কুমার গুলসুনাহর শিকারে গিয়া গন্ধর্বকন্যা মৃগরূপিণী চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং সখাদের লইয়া গন্ধর্ব নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। বহু দেশ পার হইয়া অবশেষে তাহারা গন্ধর্ব নগরে গিয়া এক মালিনীর গৃহে আশ্রয় লইল। সুড়ঙ্গপথে মালিনীর ঘর হইতে চন্দ্রমুখীর ঘরে গিয়া গুলসুনাহর প্রণয়লীলা করিতে লাগিল। কুমার ও চন্দ্রমুখীর প্রণয়লীলা বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়লীলা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এদিকে কুমারের সন্ধান করিতে করিতে যখন মিছির নগরের লোক আসিয়া মালিনীর ঘরে উপস্থিত হইল তখন পিতামাতার জন্য কুমারের মন কাঁদিয়া উঠিল। বন্ধুদের পরামর্শে রাজপুত্র কৌশলে চন্দ্রমুখীর কাছ হইতে বিদায় নিলেন। বন্ধুরা পরামর্শ দিল,

যেই না পালঙ্কে শুইয়া থাকে চন্দ্রমুখী
সন্ধি করি ফুলের ভেরা তথা যাইও রাখি।
চন্দ্রমুখীর মুখেতে পানের বীড়া দিয়া
সে অঙ্গুলি তোমার লইও বসাইয়া।
ধীরে চালাইও পাও নিশাভাগ হৈলে
তরিতে সকলে মিলে যাইমু নদীর কুলে।

রাজপুত্রও তাহাই করিলেন এবং বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ঘাটে গিয়া দেশের অভিমুখে নৌকা খুলিয়া দিলেন।

সকালবেলায় নিদ্রাভঙ্গের পর চন্দ্রমুখী কুমারের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিল এবং দরবেশ যোগীর বেশ ধরিয়া কুমারের সন্ধানে নদীর তীর ধরিয়া ছুটিল। রাজকুমারী সহজেই আরামপ্রিয়, এত কষ্ট সহিবে কেন? তাই;

"খনে মাত্র লড় দিয়া খনে মাত্র ধীরে।
গাছের ছিকড় লাগি পড়ি পাছাড় গাত্র ॥
কোমল চরণ কাটি লহ বইআ যাত্র।"

কিছু দূরে গিয়া সে এক ডিঙ্গা দেখিতে পাইল। চন্দ্রমুখীর বিলাপ শুনিতে পাইয়া কুমার অস্থির হইল এবং সখাগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দরবেশ বেশী চন্দ্রমুখীকে নৌকায় তুলিয়া নিল। কিন্তু সে চন্দ্রমুখীকে চিনিতে পারিল না। চন্দ্রমুখী যখন বলিতেছে,

"নয়ন থাকিতে তুমি জনমের অন্ধ
কিমতে চিনিবার তুমি গগনের চান্দ।

তখনও রাজপুত্র তাহাকে চিনিতে পারিল না।

নৌকা মিছির নগরের ঘাটে ভিড়িলে রাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়িল। পুত্র-সখা জগন্বরের মুখে পুত্রের বিষয় অবগত হইয়া রানী অবিলম্বে মহাধুমধামে ইন্দ্রের অপ্সরীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কুমারের জিদে দরবেশ বেশী চন্দ্র-মুখীও বাসরে গেল। কুমার বলিল, প্রাণের বন্ধু দরবেশকে

'এক পল না দেখিলে না রহে জীবন।" কাজে কাজেই রাজাকে রাজী হইতে হইল। দরবেশকে পাশের ঘরে রাখিয়া কুমার একলা বাসর ঘরে ঢুকিল। দরবেশবেশিনী চন্দ্রমুখীর পক্ষে ইহা মর্মান্তিক হইল। সে তখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখিল না এবং মৃত্যুবরণ করিবার পূর্বে আপন পরিচয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় দরবেশ বেশ পরিত্যাগ করিয়া আপন বেশ ধরিল। নববধূরূপে সজ্জিতা হইয়া কুমারের নিষ্ঠুরতায় চন্দ্রমুখী 'কাটারি হির্দে'তে হানি তেজিল জীবন।' অর্ধরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া কুমারের দরবেশের কথা মনে হইল। দরবেশের সাড়া না পাইয়া পাশের ঘরে আসিয়া চন্দ্রমুখীর মৃতদেহ দেখিয়া সে সকলই বুঝিল। আপন মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া কুমার চন্দ্রমুখীর শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রমুখীর পথ অনুসরণ করিল। স্বামীর বিলোপান্তি শুনিয়া নববধূ সে ঘরে আসিয়া দেখিল পালঙ্কের উপর স্বামী এবং আর এক পরমা-সুন্দরীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামীশোকে হতবুদ্ধি হইয়া নববধূও 'সেই সে কাটারি হানি তেজিল পরাণ।" সকালে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনটি দেহ সৎকারের সময় ইসানবী আবিভূর্ত হইলেন এবং সকল শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া তিনজনের প্রাণ দান করিলেন। এদিকে গন্ধর্বনগরীর রাজা কন্যার সন্ধানে চর পাঠাইয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করার পর বৃদ্ধ চর মিছির নগরে কন্যাকুমারের সাক্ষাৎ পাইল। তখন তাহার অনুরোধে পিতার অনুমতি লইয়া কুমার চন্দ্রমুখীকে লইয়া গন্ধর্বনগরীতে গেল। কন্যার পিতা

ফিরোজশাহ্ কন্যা জামাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিলেন। তখন—

পুরীতে আনন্দ হৈলা অন্ধকার পরকাশীলা
চন্দ্রমুখী আইলা আপন দেশে নারে ॥
ওধম খুলিলে কএ, শব বাতে দুষী হএ,
কইনা দামান্দ হইলা আনন্দিত নারে।

—পুঁথির পাঠ।

(৩) দামিনী চরিত্র—

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত এই গীতিকা সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন সর্বপ্রথম বিশ্বভারতী পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) কার্তিক-পৌষ ১৩৫২ সালে প্রকাশ করেন। দামিনী চরিত্র গাথাটি বর্ধমান সাহিত্য সভার ১৯৯ সংখ্যক পুঁথির অন্তর্গত। ডঃ সুকুমার সেন এই গাথাটি সম্বন্ধে বলেছেন—"পূর্ববঙ্গ গীতিকার সৎসাহিত্য সুলভ রোমাণ্টিক সৌন্দর্য ইহাতে নাই। অশিক্ষিত গায়নের অর্থহীন শৈথিল্যও নাই। আলোচ্য দামিনী চরিত্রে আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পল্লী গাথায় অকৃত্রিম অতএব অনুজ্জ্বল সরল রূপটি পাইতেছি। দেবদেবীর বন্দনা বা দোহাই নাই। সুতরাং এটি একটি লৌকিক প্রণয়-গাথার দুর্লভ প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

'দামিনী চরিত্র' গাথাটির কাহিনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হল—

অতি শৈশবে নায়িকার যখন বিবাহ হয় তখন স্বামীকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই। দৈববসে স্বামী বিদেশে বাণিজ্যে গেলে, পিতৃগৃহে পতিবিরহিনী নায়িকার দিন কাটিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নায়িকা যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে তখন বাণিজ্য হইতে ফিরিবার পথে নায়িকার স্বামী আপন পরিচয় গোপনান্তে একান্তে পত্নীর প্রণয় প্রার্থনা করিয়া এক বৎসরের বারটি মাস ধরিয়া নানা প্রলোভনে তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। পত্নীর নিষ্ঠা কিছুতেই টলিল না। তখন নায়ক-নায়িকার বহু আকাঙ্খিত মিলনে কাহিনীটি সমাপ্ত।"

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক গাথা ঠিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নাহলেও এর ভিতর যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা ঐতিহাসিকদের কিছুটা সাহায্য করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি গাথা যেমন

(১) হেষ্টিংসের রাস্তার গান—রচয়িতা মদনমোহন

(২) গোরার গান-রচয়িতা দ্বিজ দ্বারকানাথ

(৩) মদনমোহন বন্দনা

(৪) কীর্তিচন্দ্রের গাথা—

(৫) সাঁওতাল বিদ্রোহের গান—রাইকৃষ্ণ দাস

(১) হেস্টিংসের রাস্তার গান—মদনমোহন রচিত গাথাটি শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র-প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গাথাটি বিষ্ণুপুর থেকে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন বাংলা পুঁথির ভেতর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তখন প্রাপ্ত পুঁথিটিকে শতাধিক বর্ষের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে গাথাটির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বলে অনুমান করা হয়েছে, তা হলে গাথাটির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বলে অনুমান করা যেতে পারে। 'রাস্তার গান' বিষয়ক দুটি পুঁথিই বাঁকুড়া-বর্ধমানের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত। দুটি গাথার কাহিনী এক হলেও কিন্তু ভাষা ও ছন্দ পৃথক। মদনমোহন রাস্তার গানের বর্ণনা দিতে গিয়ে রঙ্কিনীদেবীর নাম নিয়ে আরম্ভ করেছেন—

শুন শুন সর্বজন একমন হঞা।
রঙ্কিনী যখন আইল জাংগার বাহিঞা ॥

যোগেশচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরের ইতিহাসে দেখা যায় খর্গপুর থানার অন্তর্গত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খর্গপুর ষ্টেশনের নিকটবর্তী ইন্দাগ্রামে খড়্গেশ্বর নামে মহাদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। এর কিছুদূরে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ রাস্তার পাশে পীর লোহানী সাহেব নামে এক মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। পীর লোহানীর অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কাহিনী আজও শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমান সমভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করে আসছে। পীর লোহানী সাহেবের আস্তানার অনতিদূরে একটি প্রাচীন ভগ্নমন্দির দেখা যায়। লোকে একে রঙ্কিনী দেবীর মন্দির বলে কিন্তু মন্দিরে বর্তমানে কোন মূর্তি নেই। জনশ্রুতি, যখন ঐ মন্দিরে রঙ্কিনী দেবী ছিলেন সেই সময়ে তাঁর আহারের জন্য প্রতিদিন পালাকরে প্রতিটি গ্রামের গৃহস্থকে একটি করে মানুষ দিতে হত। একদিন এক দুঃখিনী বিধবার পালা। বিধবার একটি অল্পবয়স্ক পুত্র ছাড়া আর কেহ ছিল না। পুত্রকে আহারের জন্য দেবীকে দিতে হবে এই চিন্তায় দুঃখিনী জননী কেঁদে আকুল হলেন। দুঃখিনীর কান্নায় মর্মাহত

হয়ে পরদুঃখকাতর পীর লোহানী সাহেব পুত্রের পরিবর্তে নিজে দেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। দেবীর সঙ্গে পীর সাহেবের যুদ্ধ হল। দেবী পরাস্ত হয়ে মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করেন। তারপর দেবী জঙ্গল-ভূমির নিবিড় অরণ্যে ঢুকে এক রজকের গৃহে আশ্রয় নেন। কবি মদনমোহন তাঁর গাথায় রঙ্কিনী দেবীর এই পলায়নের কথা উল্লেখ করেছেন। কবি গাথার প্রারম্ভে হেস্টিংসের পলায়নের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

চৈতন্য সিংহ মহারাজ বলে সর্বজন।
চলিল তার সনেতে চলিলা তার সনেতে
রণ করিতে হিস্টনী হারিল।
দেখরঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল ॥
পালাল প্রাণ লইআ, পালাল প্রাণ লইআ,
সব ছাড়িআ কলিকাতা পঁহুছিল।
আটকোচনের সাহেব মেলি, আটকোচনের সাহেব মেলি,
রঙ্কিনী কহিল

এইভাবে পলায়ন করে হেস্টিংস সম্ভবতঃ অপমান বোধ করলেন এবং প্রচুর সৈন্য নিয়ে পুনরায় চৈতন্যসিংহকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে যুক্তি করে কোম্পানীকে চণ্ডালগড় থেকে শালিকাঘাট পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করবার হুকুম দিলেন। এই রাস্তা নির্মাণের ধারাবাহিক বিবরণে যে সমস্ত অঞ্চলের নাম পাওয়া যায় সকলই বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটের সঙ্গে মিলে।

গাথার বিবরণে আছে চণ্ডালগড়ে থানা করে সেখান থেকে রাস্তা তৈরী করে বরাবর দক্ষিণপূর্ব দিকে নয়নজুলি, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, খাটুল বা ঘাটাল, হরিপাল, ভরশুট, পরগণা, কাটরাজুলা হয়ে রাস্তাটি 'শালিখাঘাটে উত্তরিল গিআ।'

উপরের জায়গাগুলি বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়ার অন্তর্গত। তাহলে রাস্তাটি এ সমস্ত জেলার ওপর দিয়ে গেছে।

অবশেষে শালিকাঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ শেষ হলে,

আড়পার কলিকাতাতে, আড়পার কলিকাতাতে
নৌকা পথে গঙ্গা পার হল্য।
সহর দিয়া হুজুর হতনা কুর্নিশ করিল।

রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্যে বেগার ধরে খাটানোর চরম দুর্দশার কথা দ্বিজ রাধামোহন ব্যক্ত করেছেন—

ফেলাএ লাগিল মাঠে
ফেলাএ লাগিল মাঠে পালায় ছুটে যত চাষীগণ
বেগার ধরিতে আইল কত শত জন।
যেন চৈত মাসে
যেন চৈত মাসে ভক্ত্যা-ধরা
ব্যাপহারা যেদিকে যাকে যাকে পায়
হাতে বেঁদে গোঞ্চা মেরে রাস্তাতে খাটায়।
হাতে করে বেতের বাড়ি
হাতে করে বেতের বাড়ি তাড়াতাড়ি-মারে (সবার) পিঠে
বেতের ভয়ে যত কোড় চতুর্দিকে ছুটে।

রাস্তা সমাপ্ত জানিয়া সাহেব আনন্দিত হয়ে 'পাঠাইল বহু সৈন্যদল'। সেই নির্মিত রাস্তা দিয়ে হেষ্টিংসের সৈন্যদল চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল।

শ্রীগুরু ভাবিআ কহে মদনমোহন ॥
মেদিনীপুরে স্থিতি মেদিনীপুরে স্থিতি।
হল্য ইতি রাস্তার কবিতা।
হরি হরি বল সভে ঘুচিবে ভবচিন্তা ॥

(২) গোরার গান—রচয়িতা দ্বিজ দ্বারকানাথ

বীরভূম জেলার দুবরাজপুর চৌকীর কুলুটিয়া গ্রামের দ্বিজ দ্বারকানাথ ১২৮০ সালের (বাংলা) ৯ই ভাদ্র তারিখে গোরার গান গীতিকা রচনা করেন। ইংরেজ সৈন্য বীরভূম জেলার ভেতর দিয়ে যাত্রা করলে গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এই হল গীতিকাটির প্রতিপাদ্য বিষয়।

"গাথাটির ঐতিহাসিক পটভূমিকা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাংলা ১১৭৬, ইংরাজী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ মন্বন্তর হইয়াছিল তাহাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। মন্বন্তর পীড়িত কৃষকগণকে লইয়া কোম্পানী ছিনিমিনি খেলিতে শুরু করেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। জমিদারদের সহিত জমির পাঁচশালা, দশশালা, অবশেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

এই গীতিকাটি গৌরীহর মিত্রের বীরভূমের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কবি নিজে গৌরীহর মিত্র মহাশয়ের পিতা শিবরতন মিত্র মহাশয়ের কাছে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ গান' নামে গীতিকাটি পাঠিয়ে দেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস আদিবাসী স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় ঘটনা। কবি কাহিনীটির আরম্ভে বলেছেন—

আমি ভাবি মোনে সাঁওতাল গণে রাখিলে জে যুক্ষ্যাতি
জে কিছু লিখিলাম আমি সকলি ও সত্তি।

বিদ্রোহের কারণস্বরূপ 'বীরভূমের ইতিহাস' প্রণেতা বলেছেন "১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বহু সাঁওতাল জংগলাকীর্ণ দামন-সীমানার মধ্যে বসবাস স্থাপনের জন্য প্রবেশ করে ও কৃষিকর্ম করিয়া ইহাকে বাসোপযোগী করিয়া তোলে। অন্যান্য পাহাড়িয়া জাতির মত তাহারা এইখানে বসবাসের অন্যান্য সুবিধা ও অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল প্রবেশলাভের অধিকার পাইয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা অসহায় হইয়া পড়িলে স্থানীয় মহাজন ও অন্যান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের উপর ঘোর অত্যাচার চালাইতে লাগিল। অত্যাচারের ফল ফলিল—তাহাই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতালগণের এই বিদ্রোহ অভিযান কার্যতঃ ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে চালিত হইলেও তাহাদের আক্রোশ মূলতঃ স্থানীয় মহাজনদের উপর ছিল এবং এই কারণেই তাহারা সর্বাগ্রে মহাজনদের আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে এবং তাহাদের জিনিষপত্র লুট করিয়াছে।"

"ইংরাজ সৈন্যের গুলিতে বহু সাঁওতাল প্রাণ হারায়, কিছু পলাইয়া যায় আর কিছু ধরা পড়ে। বিদ্রোহী নেতা কানুর ফাঁসী হয়। পরে সিধুকে তাহার স্বগ্রাম পাঁচকেথিয়ায় ধরিয়া লইয়া গিয়া বহুসংখ্যক সাঁওতাল ও অপরাপর জাতির সম্মুখে মিঃ পোটেন্ট সাহেব তাহার ফাঁসী দেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে রাজমহল মহকুমার পাঁচকেথিয়ার বাজার চৌধুরী ধনকৃষ্ণ রুদ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতা সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বাংলা কবিতা গ্রন্থে দেখা যায়।

কীর্তিচন্দ্রের গাথা—রচয়িতা অজ্ঞাত

ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র গাথায় কীর্তিচন্দ্র গাথা তাৎপর্যপূর্ণ। এই গাথায়

বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের দানশীলতা, পরাক্রম ও মৃত্যুকাহিনী সম্বলিত। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে জগৎরায়ের মৃত্যু হলে রাজবংশের নিয়মানুযায়ী জ্যেষ্ঠ কীর্তি-চন্দ্র সম্পত্তির অধিকারী হন। কীর্তিচন্দ্র তাঁর জমিদারীর এলাকা বিস্তার করতে থাকলে তাঁর সঙ্গে ঘাটালের রাজার বিরোধ ঘটে। এই গাথায় রাজার চন্দ্রকোণা অভিযান এবং শেষে তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জাল প্রতাপচাঁদ—কার্তিকচন্দ্র সিদ্ধান্ত

বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদ। বাল্যকালে তাঁর মাতৃ-বিয়োগ হয়। বিমাতা ও তাঁর সহোদর ভাই-এর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভের আশায় প্রতাপচাঁদ আঠাশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। বৃদ্ধ রাজা তেজচন্দ্র তাঁকে রাজমহল থেকে ধরে আনেন। কিছুকাল পরে একদিন কালনার গঙ্গাতীরে অসুস্থ প্রতাপচাঁদের অন্তর্জলী অবস্থায় মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনা ঘটে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। প্রায় পনের বছর পর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এক নবীন সন্ন্যাসী বর্ধমানে আসলে কেহ কেহ তাঁকে প্রতাপচাঁদ বলে চিনতে পারলে সেই কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে যায়। রাজা তেজচন্দ্র কিছুকাল পরাণবাবু পুত্রকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন। পরাণবাবু এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে লাঠিয়াল দিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। আদালতে এই ব্যাপারে বিচার হয় আর প্রতাপচাঁদ বিচারে জাল সাব্যস্ত হন।

জাল প্রতাপচাঁদ নিয়ে বহু কাহিনীকাব্য তৎকালীন সময়ে লোকমুখে এবং গ্রাম্যকবির বিবরণে পাওয়া যায়। অনুপচন্দ্র দত্তের প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত থেকে জানা যায় জাল প্রতাপচাঁদকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও গৌরাঙ্গের অভিন্ন আত্মা বলে মনে করতেন। এই কাহিনী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামে প্রকাশ করা হয়। এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ ১৩০৮ ও ১৩০৯ সালে বীরভূম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি জাল রাজা প্রতাপ-চাঁদকে পাণ্ডবদের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন—

কার্তিকচন্দ্র সিদ্ধান্তের বাণী শুন ঈশ্বর চক্রপাণি
ছোট রাজা পাপক্ষয় করিল আপন।
দ্বাপরে পাণ্ডবগণ করিয়াছিল যেমন
সেই মত প্রতাপচন্দ্র করিল এখন।

মদনমোহন বন্দনা—

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—২য় খণ্ডে' একটি মদনমোহন বন্দনা গাথা প্রকাশ করেছেন। তাতে মদমোহন কর্তৃক বিষ্ণুপুর গড় রক্ষার বিবরণ লিপিবন্ধ আছে। রতন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা'য় মদনমোহনের নানা মহিমার বিষয় বর্ণিত আছে।

বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর যিনি একসময় দস্যু সর্দার ছিলেন তিনি মদনমোহন স্থাপন করেন। বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল ১৫৮৬ থেকে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ষোড়শ শতাব্দীতে মদনমোহন বিষ্ণুপুরের রাজপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হন।

মল্লবংশের গৌরব অম্লান রাখবার জন্য বীর হাম্বীর ব্রাহ্মণের ঘর থেকে মদনমোহনকে অপহরণ করেন।

এরপর মদনমোহন কর্তৃক গড় রক্ষার বিবরণ গাথাটিতে পাওয়া যায়। বাহান্ন হাজার বর্গী রাজার গড় লুটিতে আসিয়াছে, এই খবর পাইয়া রাজা বলিলেন 'আমার সহায় কেবল মদনমোহন'। অন্তর্যামী ভগবান রাজার এই কথা শুনলেন। ভক্তের ভগবান তখন আপনিই চলিলেন বর্গী তাড়াইতে। রণসজ্জায় সাজিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া মদনমোহন ছদ্মবেশে যুদ্ধে চলিলেন।

দল মাদল কামান ছিল লাল বাঁধের ধারে।
আশী মন বারুদ দিল তাহার ভিতরে॥
সেই কামান মদনমোহন দুই বগলে নিল।
দুই হস্তে দুই কামানে পলুতে জেবলে দিল॥
এক তোপেতে কতশত বর্গী মরে গেল।
কামানের মহাশব্দে লোকের মূর্চ্ছা হল॥
দশমাসের গর্ভবতীর গর্ভপাত হল।
পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত শব্দে মাটি ফেটে গেল॥

রণক্লান্ত হয়ে অতঃপর মদনমোহন বিষ্ণুপুরের রাজপুত্র পরিচয়ে গোয়ালার কাছে গিয়ে দৈ চেয়ে খেলেন—

ছল করি পাতিলেন হাত মদনমোহন।
দুই হস্তে দৈ খাইলেন সাড়ে ষোল মন॥

এদিকে রাজা মদনমোহনকে খুঁজতে খুঁজতে গোয়ালার কাছে এলেন। গোয়ালা রাজাকে বলল রাজপুত্র দৈ খেয়ে গেছে তখন

রাজা বলে গোয়ালা তোর সার্থক জীবন।
ছেলে নয় দৈ খেয়েছেন মদনমোহন ॥

কথিত আছে এই গোয়ালা বাগবাজারে গোকুল মিত্র নামে জন্ম নিয়েছিলেন। তার পূর্বজন্মের ইচ্ছানুযায়ী মদনমোহন কিভাবে বিষ্ণুপুর থেকে গোকুল মিত্রের কাছে এলেন গাথাকার তার পরিচয় দিয়েছেন। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ মদনমোহনকে গোকুল মিত্রের কাছে বাঁধা দিয়েছিলেন। এই তথ্য A. P. Mallik তার History of Bishnupur Raj গ্রন্থে লিখেছেন "Chaitanya Singha managed to escape with the family God Madan Mohan by a private gate and first went to the Nawab a Murshidabad. But knowing that the East India Company had received the grant of the Burdwan chakla in 1760, he proceeded to the English at Calcutta. Here at Calcutta, having spent all his money in conducting the case in the court of the English (with the help of the Dewan Ganga Gobinda Singha) he had to pown the idol Madan Mohan to Gokul Mitra of Baghbazar Calcutta, originally inhabitant of Konnagar, who had made his fortune through trading in salt."

চৈতন্য সিংহ মদনমোহনকে গোকুল মিত্রের কাছে বন্ধক রাখেন, গোপাল সিংহের সময় মদনমোহন বিষ্ণুপুরেই ছিলেন। গাথাটিতে মদনমোহনের অভাবে বিষ্ণুপুরের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—

বাগবাজারে এসে ঠাকুর রৈলেন বসে।
বিষ্ণুপুরে শ্রীমন্দিরে পাথর পড়ে বসে ॥
রাজা কাঁদে, রাণী কাঁদে, কাঁদে প্রজাগণ।
পূজারী ব্রাহ্মণ কাঁদে হয়ে অচেতন ॥

বাগবাজারে গোকুল মিত্রের ঘরে মদনমোহন নানারূপ লীলাখেলার মধ্য দিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন গোকুল মিত্র নিদ্রাভঙ্গের পর 'মদনা' নামক চাকরকে ডাকিয়া তামাক চাহিলে, ঠাকুর মদনমোহন 'মদনা' চাকরের রূপ ধরিয়া মিত্রের হাতে তামাক দিলেন। তামাকের সুমিষ্ট গন্ধে তৃপ্ত হইয়া গোকুল মিত্র ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে বিষ্ণুপুরের তামাক কোথায় পাইল। কিন্তু

তখন ঠাকুর অন্তর্ধান করিয়াছেন, উত্তর কে দেবে ? এদিকে পূজারী ব্রাহ্মণ পূজা করিতে গিয়া দেখেন ঠাকুরের হাতে তামাক ও টীকার দাগ। তখন তিনি মিত্রকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। মিত্র বুঝিলেন এ ঠাকুরের লীলাখেলা।"

মদনমোহন নানা লীলাখেলার মধ্যে দিয়ে গোকুল মিত্রের ঘরে দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে মদনমোহনের অবর্তমানে সকলেই মুহ্য। বিষ্ণুপুরের রাজা তখন বাল্যরাজ। একদিন রাণী তাঁহাকে বলিলেন—

আমার গজমতি হারে পাঁচ লক্ষ টাকা হবে।
সুদ সমেত দিয়ে মদনমোহনে আনিবে ॥

বিষ্ণুপুরের রাজা একদিন তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজনে মদনমোহনের পরামর্শক্রমে তাঁকে গোকুল মিত্রের কাছে বাধা দিয়েছিলেন। এখন রাণীর অনুরোধে রাজা গজমতি হার নিয়ে গোকুল মিত্রের কাছে গেলেন। গোকুল মিত্র বন্ধকী কোয়ালা অস্বীকার করে বললেন তিনি মদনমোহনকে বন্ধক নেননি কিনে নিয়েছেন। এই কথা শুনে বাল্যরাজ কাঁদতে কাঁদতে ফিরছেন তখন মদনমোহন পথের মাঝে তাঁকে দেখা দিলেন। তিনি বললেন আলিপুর কোর্টে দরখাস্ত দিতে। মদনমোহন নিজেই বাল্যরাজের পক্ষ নিয়ে উকিলের ছদ্মবেশে কোর্টে গিয়ে হাজির হলেন। মামলায় বাল্যরাজের জয় হল। গোকুল মিত্র কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরলেন। মদনমোহনকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা না থাকায় গোকুল মিত্র কুমারটুলি থেকে নকল মূর্তি তৈরী করালেন। সেই মূর্তিটি বাল্যরাজের হাতে দিলেন। মদনমোহনের নির্দেশে আসল মূর্তিটি চিনে নিলেন। আসল মদনমোহনকে হারিয়ে গোকুল মিত্র কাঁদতে লাগলেন তখন ঠাকুর তাঁর প্রতি সদয় হয়ে বললেন—

বৎসরান্তে তোমার বাড়ীতে 'অন্নকূট' হবে।
দ্বাদশ দন্ড আমায় তখন দেখিতে পাইবে ॥

বাল্যরাজ ঠাকুর নিয়ে বিষ্ণুপুরে ফিরে আবার রাসদোলে চারিদিক মুখর হয়ে উঠল।

পশ্চিমবঙ্গে গাথা ও গানের মধ্যে দেবদেবী তাদের নিজ নিজ পরিবারের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই দেবদেবীগণ নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তি ত্যাগ করে পারিবারিক আচার আচরণে ভক্তদের মনোরঞ্জন করেন। গ্রাম্য কবিদের কথায় ও গাথায় হর-পার্বতী হলেন গ্রাম্য সমাজের গৃহ দম্পতি। আগমনী থেকে বিজয়ার

দিন পর্যন্ত পল্লীবালারা নিজ কন্যার মত গৌরীর আগমনে যেমন উল্লসিত তেমন বিজয়ার বিরহে মর্মাহত। হরগৌরী ও কৃষ্ণরাধাকে নিয়ে কতশত জল্পনা-কল্পনা। তাঁরা যেন আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে তাঁদেরকে পার্থিব জগতে আপন করে নিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থে লিখেছেন "হরগৌরী এবং কৃষ্ণরাধাকে লইয়া আমাদের গ্রাম্যসাহিত্য রচিত তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা।"

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে গুরুসদয় দত্তের অবদান অপূরণীয়। তিনি কেবল পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেননি পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে বহু পুঁথি সংগ্রহ করে বিদগ্ধ সমাজের কত উপকার করেছেন তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। গুরুসদয় দত্ত শিব ও দুর্গার ছবি যা তাঁর 'পটুয়া সঙ্গীত' গ্রন্থে এঁকেছেন তা নিছক বাংলার গ্রামীন সমাজের চিত্র। তিনি দুর্গাকে বান্দিনী রূপে পটুয়া শিল্পীরা চিত্রিত করেছেন তাঁদের লৌকিক প্রেমের সাহসে। এখানে ভগবৎ প্রেমে অপেক্ষা লৌকিক প্রেম কত খাঁটি। কত সরল কত সহজ তাতে কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই শুধু প্রাণখোলা মনমাতান ভালবাসা মা দেবতাদের দেবলোক থেকে মনুষ্যলোকে টেনে এনেছে। 'পটুয়াশিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে, তাহার কৃষ্ণরাধা, গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাঙ্গালী, শিব ও পার্বতী পুরা বাঙ্গালী। বড়াই বুড়ির ছবি বাঙ্গালী ঠাকুরমা ও দিদিমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্তি। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্যাদা ও আদর বেশী।"

পশ্চিমবঙ্গে পটুয়াগণ কৃষ্ণরাধা, শিবদুর্গা ও রামসীতাকে ছোটবড় গাথা রচনা করে মন্দিরা বাজিয়ে লোকের ঘরে ঘরে গান গেয়ে ভিক্ষা করত। গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত বহু পুঁথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত আছে। তাঁর সংগৃহীত গাথা থেকে কয়েকটি উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হল—

(ক) মৎস্যধরা পালা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ৩২৭৬, ২৪৫৩, ৩৮৪৭) রামেশ্বরের ভণিতা

"দুর্গা সাধারণ নারীর ন্যায় আপন স্বামী নিন্দা করিয়া নারদের নিকট অনুযোগ করিতেছে যে, অন্য লোক চাষ করিতে যায় আবার ঘরেও ফিরিয়া আসে কিন্তু ভোলা মহেশ্বর চাষ করিতে গিয়া আর ঘরে ফিরলেন না। দুর্গা নারদের নিকট পরামর্শ চাহিতেছেন—

উপায় বল নারদ বাছা বুদ্ধি বল মোরে।
তোমার মামা ঘরকে আসে কেমন প্রকারে ॥

নারদ তখন দুর্গাকে বান্দীনীরূপ ধরিয়া শিব সন্দর্শনে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

নারদের পরামর্শ দুর্গার বেশ মনঃপুত হইল এবং তাঁহার আদেশে 'স্বর্গের' 'কামিলা জাল, দড়ি নির্মাণ করিয়া দিল' জাল, দড়ি লইয়া বাগ্দিনীবেশে দুর্গা শিব সন্দর্শনে চলিলো না মাঠে গিয়া ধান দেখিয়া পার্বতী খুশী হইলেন। কিন্তু ধান্যক্ষেত্রের জল ছেঁচিতে গিয়া দুর্গা এমন গন্ডগোল বাধাইয়া দিলেন যে, বসিবার আসন শিবের করে টলমল'। শিব তখন সংবাদ জানিতে ভীমকে ধান্য ক্ষেত্রে পাঠাইলেন। শিবের আজ্ঞা পাইয়া ভীম—

স্বরূপ পুরের মাঠে গিয়া ব্রহ্ম ডাক ছাড়ে
ভীমের শব্দেতে আকাশ-পাতাল নড়ে।

এমন সময় বাগ্দিনী রূপিনী দুর্গাকে দেখিয়া ভীম বলিতে লাগিলেন—

পালাবি তো পালা গো রূপের বাগ্দিনী—।
কেড়ে নিব জাল দড়ি নেখিয়ে ভাঙব হাঁড়ি।
ধরে লয়ে যাব তোরে মামার বরাবরি
যতগুলি ধান ভেঙ্গেছে গুনে নিব কড়ি

দুর্গা ভীমের সঙ্গে বচসা শুরু করলেন। অবশেষে ভয় পেয়ে ভীম পালিয়ে শিবের কাছে গিয়ে বলছে—

ভাগ্যে-পুণ্যে বেঁচে এলাম বাগ্দির কন্যার হাতে।

শিব বলেন—

পেমন রূপের বাগ্দিনী কেমন চরিত।
মেয়ে হয়ে পুরুষ বধ শুনি বিপরীত ॥

ভীম দুর্গা রূপের বর্ণনা করে বলছে—

কাল নয় গোর নয় মামা মধুর বরণ খানি।
দূর হতে দৃষ্টি করলাম ঘরে যেমন মামী।

শিব তখন ভীমকে সঙ্গে নিয়ে বাগ্দিনীকে দেখতে চললেন। শিব কিন্তু বাগ্দিনীবেশী দুর্গাকে চিনতে পারলেন না। শিব বাগ্দিনীবেশী দুর্গাকে বললেন "ধান্য ভেঙ্গে মৎস্য মার বুকে নেইকো ভয়।" শিব ও ছদ্মবেশিনী পার্বতী ঝগড়া শুরু হল। অবশেষে ভীমের পলায়নের কথা শুনে শিব লজ্জিত হয়ে পার্বতীর পরিচয় জানতে চাইলে স্বার্থবোধকরূপে পার্বতী আপন পরিচয়

দিলেন। শিব দুর্গার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। এই সুযোগে দুর্গা শিবের আঙটি চেয়ে নিলেন। তারপর দুর্গা কোপায় দানোদর, চিলে খাড়মোড়ী কমলা পদ্মাবতী প্রভৃতি নদীকে স্মরণ করে বন্যা বহিয়ে দিলেন। দুর্গা স্নান করবার আছিলায় শিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৈলাসে ফিরলেন।

শিব বাড়ি ফিরলে দুর্গা নারদকে ডেকে শিবকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন—

তোর বাগদীমামা ঘর এল তোর বাগদী মামী কই
অংগুরীটি দেখি না হে অংগুলের উপর।

শিব বললেন,

ভূঁই নিড়াইতে বসেছিলাম বড় ধানের ভূঁয়ে।
আংগুরীটি গিয়াছে পড়ে তাও নাইকো মনে॥

দুর্গা অংগুরিটি শিবের কাছে ফেলে দিলেন শিবঠাকুর মহা বিপদে পড়ে গেলেন। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধির জোরে শিব দুর্গাকে উল্টাচাপ দিলেন

বাগদিনী নয় ওগো দুর্গা অভয়ামংগল
ওই প্রকারে বোঝ তুমি পরপুরুষের মন।

এত বড় অপমানে দুর্গার মাথা হেঁট হল।

চাষপালা-(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিসংখ্যার ২৪৫৫)

ভনিতা রামেশ্বর গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত পালা,
গৌরিহর মিত্র সংগৃহীত পালা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পুঁথি

এই গাথাটিতে গ্রাম্যকবি শিবদুর্গার গহস্থালীর বর্ণনা করেছেন।

এদিকে শিবের ঘরে অন্ন নাই বাতাসে নড়ে হাঁড়ী
সকল যে ধন দিয়ে, আপনি ভিখারী।

শিব দুর্গাকে বললেন—

তোমা অন্ন আজ আর ঘরে বসে খাব।

গৌরী জানালেন এক মুঠাও চাল নেই। শিব দুর্গার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে বললেন—

কাল ভিক্ষা করিলাম দুর্গা কগেনি নগরে
কি বুঝে বল গৌরী অন্ন নাইকো ঘরে।

দুর্গা গ্রাম্যবধূটির মত মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন—

কতকগুলি ঘরের ব্যয় না জানে বুড়াটি।
তোমার একলা ভীমকে চায় বাহান্ন পৌটি॥

হাতে খড়ি করি গোসাঞী নাও কেন্নে লেখা।
উচিত কথা বলতে হলেই মুখ কর্ছো বাঁকা ॥
ভিক্ষার অন্নে কুলায় না ঠাকুর চাষে দাও মন।
ফল তুলসী পাবে সকল দেবগণ ॥
অন্যলোকের বালকগুলি দুধে ভাতে খায়।
সোনার চাঁদ গণপতি অন্নকে লালায় ॥
চাষ কর্ম কর ঠাকুর সুখে অন্ন খাব।
বড় বড় মুনির নাগাল দুয়ারে বসে পাব ॥

শিব কিছুতেই চাষ করতে রাজী হন না বয়সের দোহাই দিয়ে তখন দুর্গা "কার্তিক-গণেশ সঙ্গে দেব ঝড়ের ক্ষেতের হুরো" শিব রকমারী বাহানা ধরলেন—

কোথা পাব লাঙ্গল গোঙাল, কোথা পাব বীজের ধান।
কোথা গেলে পাব দুর্গা ক্ষেতের কৃষাণ ॥

সমস্ত দায় যেন দুর্গারই। তিনি পরামর্শে ত্রিশূল ভেঙে কোদাল-ফাল হল আর দুর্গার বাঘ ও শিবের বলদ জুড়ে হাল। দুর্গার আদেশে ভীম লক্ষীর ঘর বীজ আনতে চলল।

এরপর ভীম বীজ বেঁধে কৈলাসেতে গেল
বাঘ বসোয়াতে হাল মর্তে জুড়ে দিল।
একচাষ দু-চাষ ভীম তিন-চাষ করিল।
তিনচাষ করে সেদিন বীচন ছড়াইল।

এভাবে শিবের চাষপর্ব সমাধা হল।

ভগবতীর শঙ্খ পরিধান পালাঃ—

এই গাথাটি গৌরীহর মিত্র বীরভূমের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কাহিনীটির বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হল ঃ—

"বাঘছাল বিছাইয়া শিব ও পার্বতী বসিয়া আছেন। দেবীদুর্গা শিবের কাছে একজোড়া শঙ্খ পরিধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শিব বলিলেন, 'সোনা রুপার গহনা পর, অকালে বিক্রয় করিলে কাজে লাগিবে। রাঙা শঙ্খ পরিলে কি হইবে ?' গৌরী উত্তর করিলেন 'সোনা, রুপা পরিলে গায়ে ব্যথা হয়, শঙ্খ পরিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। তখন শিব গৌরীকে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা দক্ষরাজা ধনী, শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা হইয়া থাকিলে দুর্গা যেন তাঁহার কাছে যান। কিন্তু গৌরী স্বামীর এই অক্ষমতায় চটিয়া গিয়া গ্রাম্য নারীর ন্যায় শিবকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া কার্তিক, গণেশের হাত ধরিয়া বাপের বাড়ী

চলিলেন নারদকে উপস্থিত করিবার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার গ্রাম্যকবিগণ যথারীতি করিয়াছেন। "কুঁদুলে" নারদ আসিয়া গৌরীর মুখে সমস্ত শুনিয়া চলিলেন শিবের কাছে। দুর্গাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শিব নারদকে অনুরোধ করিলে নারদ পুনরায় দুর্গার নিকট উপস্থিত হইয়া শিব-দর্গার মধ্যে ঝগড়া লাগাইবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলিলেন 'মামী এই বেলা পালাও, মামা দেখিতে পাইলেই তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। শংখ পরিবার সাধ যদি সত্যই থাকে তো পিতা দক্ষরাজের কাছে যাও এই কথা দুর্গাকে বলিয়া নারদ শিবের কাছে ফিরিলেন এবং বলিলেন যে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তিনি মামীকে পারিলেন না। যাহাই হউক। নারদের কথা শুনিয়া শিব তাহার নিকট পরামর্শ চাহিলেন কি করিয়া পার্বতীকে ফেরানো যায়। নারদ শিবের বুদ্ধি দিলেন যে, বাঘ হইয়া পথের মাঝ পার্বতীকে বাধা দিলেই তিনি ফিরিবেন। শিব 'বড় ধরনের বাঘ' সাজিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। কার্তিক, গণেশ ভয় পাইয়া পালাইতে চাহিলে গৌরী বলিলেন 'ভয় কি, এই বাঘে চড়িয়াই বাপের বাড়ী যাইব।' এই বলিয়া দুর্গা কাপড় গুছাইয়া যেই বাঘের পিঠে চড়িতে যাইবেন অমনি বাঘরূপী শিব বনের মধ্যে পালাইয়া বাঁচিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শিব নারদকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন, তাহার বুদ্ধিতেই পার্বতী শিবের ঘাড়ে চাপিতে গিয়াছিলেন। তখন নারদ শিবকে শাঁখারী লাগিবার বুদ্ধি দিলেন। শিব গরুড় পক্ষীকে ডাকিয়া শংখ আনিবার জন্য অদেশ দিলে। গরুড় পক্ষীরা মিলিয়া সমুদ্রতীর হইতে কতকগুলি শংখ আনিয়া দিল। শংখ লইয়া মহাদেব বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া শংখ নির্মাণ করিতে বলিলেন বিশ্বকর্মা শংখ নির্মাণ করিয়া দিলে—

শাখার গুঁড়িগুলি মহাদেব গায়েতে মাখিল।
শাখাঘষা কড়িখানি ডান বগলে নিল ॥
সিদ্ধির ঝোলা গাঁজার কলকে বাঁ বগলে নিল।
শংখের পসরা মহাদেব মাথায় তুলে নিল ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
শিবের খুড়শাশুড়ী ঘরের বাহির হইল ॥
শংখ পরাবার লেগে শিবের খুড়শাশুড়ী করে তাড়াতাড়ি।
মাথায় বসন দেয় না তারা করচে হুড়োহুড়ি ॥

তখন—

সোনার খাটে বসে গৌরী রূপার খাটে পা।
শংখ পরতে বসল কার্তিক গণেশের মা।

শিব গৌরীকে শংখ পরাইয়া মন্ত্র পড়িলেন—

যাবার সময় যাবি শংখ নড়িয়ে চড়িয়ে।
আসবার সময় আসবি না শংখ বজ্রাঘাত পড়িলে।

শংখ পর হইলে গৌরী শাঁখারীর পরিচয় জানিতে চাহিলে শিব বলিলেন,

সূর্যপুরে থাকি আমি ইন্দ্রপুরী ঘর
আমার নাম দেব শাঁখারী পিতা সদাগর।

শিবের এই উদ্ধৃত উত্তর শুনিয়া গৌরী ক্রুদ্ধ হইয়া শংখ ফিরাইয়া দিবেন স্থির করিলেন। মন্ত্রের গুণে শংখ তো বাহির হইবে না তাতে দুর্গা কাটারি দিয়া হাত কাটিয়া শংখ বাহির করিয়া দিতে চাহিলে শিব বলিলেন রক্তমাখা শংখ নগরে বিক্রয় করিতে গেলে লোকে তাঁহাকে কাত বলিবে। শিবের এই কথায়।

গৌরী ক্রোধভরে চায়
তবু যে দেব শাঁখারী ভষ্ম নাহি হয়

গৌরী তখন শিবকে চিনতে পারিলেন এবং আপন ভুল বুঝিয়া

এই খানে গৌরীর ক্রোধ ক্ষান্ত হল
শিব দুর্গার যুগল মিলন কৈলাসেতে হল।

এইরূপে ভগবতীর শাঁখা পরার শখ মিটিল।

দুর্গার কোন্দল-রচয়িতা শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজ ও 'নিরঞ্জন'

এই গাথাটির লিপিকাল ১২৬৫ সাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৩০ সংখ্যক পুঁথি। দুর্গার কোন্দল গাথাটিতে গৌরী ও রাধার কলহ দেখা যায়

"শিব পার্বতীকে লইয়া কৈলাস হইতে শ্রীক্ষেত্র দর্শনে চলিলেন এবং যেখানে রাধাকৃষ্ণ বসিয়া আছেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ উঠিয়া পরম সমাদরের সহিত শিবকে আসন দিলেন কিন্তু

তখন শ্রীমতী রাধে হাস্য জে করিল।
হাস্য দেখি দশভুজা জ্বলন্ত হইল ॥

দুর্গা রাগিয়া গিয়া রাধিকার এই হাস্যের কারণ শিবের নিকট জানিতে চাহিলেন, তখন—

মহেশ বলেন সুন মহিসমর্দিনী
বিকভানুসুত রাধে রাজার নন্দিনি।

শিবের এই কথায় পার্বতী আরও রাগিয়া গেলেন। তিনি বলেন

রাজার নন্দিনি রাধে কমি কিসে আমি।

কেন না— দেবের ভাণ্ডারি তোমার তুমি মোর পতি।
কিশের অভাব মোর হাশীলা শ্রীমতি ॥

পার্বতীকে খুশী করিবার জন্য শ্রীমতি তখন পার্বতীর গুণ কীর্তন করিলে, শ্লেষ মনে করিয়া দুর্গা আরও রাগিয়া গেলেন এবং শিষ্টাচার ভুলিয়া শ্রীমতিকে কটুক্তি করিয়া বলিলেন,

নারী হএ রাজা হৈলি কোটাল হৈল হরি।
ধিক থাকুর তোকে রাধে ষুনে লাজে মরি ॥

রাধিকাও কম যান না। দুর্গার এই দুর্ব্যবহারে তিনি আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না।

রাধে বল দিগম্বরি সুন মন দিয়া
দেবের মাঝে ফির তুমি উলংগ হইএা।
পরম বৈষ্ণবী তুমি জগৎজননী
তবে কেন রুধির পান করিলে ভবানি ॥
লজ্জা সরম নাহি তোমার ভেবে দেখ মনে।
ব্রহ্মমই হএে কালি মূর্ত্তি ধর কেনে ॥

দুর্গাও পাল্টা জবাব দিলেন—

কালি মূর্ত্তি নিন্দা কৈলে রসিক নাগরি।
কালরূপ ধরে ছিল তোমার মুরারি ॥

ইহার পর দুর্গা বস্ত্রহরণের কথা উল্লেখ করিয়া রাধাকে লজ্জা দিতে চাহিলে রাধা বলিলেন, 'যাহাকে জীবন যৌবন ধন মান সব সঁপিয়াছি, তাহার নিকট লজ্জা কিসের।'

রাধা এইবার শিবের ভিক্ষা মাগিয়া খাইবার কথা বলিয়া পার্বতীকে লজ্জা দিতে লাগিলেন, তখন—

দুর্গা কহে মোর স্বামী ভিক্ষা মাগিলে পায়।
ছেনা মাখন তোর কৃষ্ট চুরি করে খায় ॥
তোর কৃষ্ট গিএাছিল ভিক্ষা মাগিবারে।
ভিক্ষা লএ বন্ধা আছেন বলি রাজার স্বারে ॥